৭.১১ নর কঙ্কাল – Bangla Library

৭.১১ নর কঙ্কাল – Bangla Library

নর কঙ্কাল–১১১

নুর পুলিশ অফিসে পৌঁছতেই মিঃ হারুন এবং মিঃ উইকো তাকে এগিয়ে নিলেন। তাদের চোখে মুখ উত্তেজনার ছাপ বিদ্যমান।

তিনবার মার্ক করলাম দূর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করলো।

মিঃ উইকো এবং মিঃ হারুনও নূরের সঙ্গে এগিয়ে এলেন এবং আসন গ্রহণ করে বললেন মিঃ হারুন আপনি এ ব্যাপারে নিখুপ থাকলে চলবেনা মিঃ নূর! জনাব আরফিন আলী সাহেবের হঠাৎ অন্তর্ধান ব্যাপারটা রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে।

নূর প্যান্টের পকেট থেকে রুমালখানা বের করে মুখটা মুছে নিয়ে বললো–হা স্যার। ব্যাপারটা রহস্যময় বটে।

বললেন–উইকো জলজ্যান্ত মানুষটা হাওয়ায় উড়ে গেলো একেবারে। আসন গ্রহণ করলো সবাই।

পুলিশ সুপার নিশ্চুপ ছিলেন এতোক্ষণ, তিনি বসে বসে সিগারেট থেকে নির্গত করে চলেছেন। এবার পুলিশ সুপার সোজা হয়ে বসে বললেন–কান্দাই শহরে এমন কিছু ব্যাপার ইদানিং ঘটছে যা শুধু রহস্যময়ই নয় একেবারে আশ্চর্যজনক।

জানি মিঃ সুপার, আপনি আমি সবাই আমরা জানি কিন্তু বলতে বাধ্য কারণ কান্দাই-এর মানুষ আজ সত্যিকারের মানুষ হিসাবে নেই তারা কলের মানুষ বনে গেছে।

মিঃ নূর আপনার কথার ঠিক অর্থ অনুধাবন করতে পারছি না? বললেন মিঃ হারুন।

পুলিশ সুপার জবাব দিলেন–হাঁ মিঃ নূর যা বলেছেন–তা সত্য কারণ আমাদিগকে অনেক কিছু জেনে শুনেও হজম করতে হচ্ছে। রাঘব বোয়াল যারা তারা করছেন সাগর চুরি তবু তারা চোর নয়, কিন্তু যারা চুনো পুটি তারা ধরা পড়ে যাচ্ছে, সামান্য কিছু অপরাধ করে পাচ্ছে নানা রকম সাজা। আমি জানি বহু নিরপরাধ মানুষ জেলে পচে মরেছে, না হচ্ছে বিচার না পাচ্ছে মুক্তি। তবুও সব জেনে বুঝে কাজ করে যেতে হচ্ছে।

আপনি একথা বলছেন পুলিশ সুপার? সরকারি চাকুরি করেন অথচ......

সরকারি চাকুরি করি বলেই অন্যায়কে মেনে নেবে এটা সব সময় সবার জন্য গ্রহণযোগ্য নয় মিঃ নূর। আপনি নিশ্চয়ই জানেন পুলিশ মহলে চাকুরি করেও সৎ মহৎ হৃদয়ের অধিকারী রয়েছেন অনেকেই।

হাঁ সে কথা মিথ্যা নয় স্যার, অনেক চাকুরীজীবি রয়েছেন তারা অন্যায়কে কোন সময় প্রশ্রয় দেন না বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আত্মাহুতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। আবার চাকুরীজীবি না হয়েও অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তি পুকুর চুরি করা থেকে সাগর চুরি পর্যন্ত করেছেন এবং নিজেকে একজন মহান নেতা বলেও জাহির করেছেন, গাড়িবাড়ি এমন কি দেহরক্ষিও আছে, গেটে প্রহরী। মাটির দেহ

তবু তাদের চরণ যুগল মাটি স্পর্শ করে না। সরকারি যানে যান যানে আসেন। খানাও খান সরকারের, বাস করেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে, ভাতা পান হাজার হাজার টাকা কথাটা শেষ করতে গিয়ে থেমে পড়লেন মিঃ হারুন।

নূর বলে উঠলো–সরকারের অর্থ মানেই জনগণের অর্থ। যে জনগণ অর্ধাহারে অনাহারে জর্জরিত। ক্ষুধায় এক মুঠি অন্ন যাদের জোটেনা, মাথা গুজবার যাদের ঠাই নাই। শুষ্ক তৈলহীন চুল, চোখ ঘোলাটে চাহনী সেই জন সমাজের রক্ত বিক্রয় অর্থ দিয়ে আজ তাদের বাহাদুরী–... যাক ওসব কথা এবার আসল কথায় আসা যাক।

ঠিক বলেছেন মিঃ নূর এখন বিলম্ব করার সময় নেই। মিঃ আরফিন আলী সাহেব তার বাসভবন হতে নিখোঁজ হয়েছেন। এতে সাবধানতার মধ্য হতেও তাকে কে বা কারা উধাও করলো এ ব্যাপারে জোর তদন্ত শুরু করা দরকার। কথাটা বলে থামলেন মিঃ হারুন।

মিঃ উইকো বললেন–আশা করছি মিঃ নূর এ ব্যাপারে সহযোগিতা করলে আমরা কৃতকার্য হবো। মিঃ আলী সাহেবকে খুঁজে বের করা সহজ হবে।

নূর হেসে বললো–আমি কৃতকার্য হবো এটা আমি বিশ্বাস করিনা কারণ তিনি স্বইচ্ছায় যদি গা ঢাকা দিয়ে থাকেন তাহলে আমার বা কারো করবার কিছু নাই। তবে আমি চেষ্টা করে দেখব স্যার।

আপনার সহযোগিতা কাম্য মিঃ নূর।

নূর সব জেনে না জানার ভান করে।

মায়ের ঘরে সুড়ঙ্গ পথে সে প্রবেশ করেছিলো ভূগর্ভে এবং এমন স্থানে উপস্থিত হয়েছিলো যে স্থানে পৌঁছে নূর শুধু অবাকই হয়নি পেয়েছে এক বিস্ময়কর ঘটনার সন্ধান। সে দস্যু বনহুরের আস্তানায় গিয়ে হাজির হয়েছিলো এবং সেখানে নূর দৈখেছে মহান নেতা আরফিন আলী সাহেবকে, যেখানে গোয়েন্দা বাহিনীর ক্ষমতা নেই খুঁজে বের করে।....

কি ভাবছেন মিঃ নূর? প্রশ্ন করলেন মিঃ হারুন।

কিছু না! নূর নিজকে সাবধান করে নেবার চেষ্টা করে।

মিঃ হারুন অভিজ্ঞ ডিটেকটিভ, কাজেই তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া মোটেই সহজ নয়। নূর যে গভীর মনোযোগ দিয়ে কিছু ভাবছিলো তা আর কেউ তেমনভাবে লক্ষ্য না করলেও তিনি করছিলেন। হেসে বললেন মিঃ হারুন–নূর এ ব্যাপারে আপনাকে অত্যন্ত সিরিয়াস হতে হবে।

স্যার, আপনাদের কথা আমি স্মরণ রেখে কাজ করবো।

এই তো চাই আমরা। মিঃ হারুন নূরের করমর্দন করলেন।

মিঃ উইকো হাসলেন মাত্র।

তিনি কান্দাই পুলিশ সুপারের প্রধান সহকারীও বটে। তার কান্দাই অবস্থান যদিও সুদীর্ঘ সময় নয় তবুও তিনি বহুদেশ সফর করার অভিজ্ঞতায় অনেক জটিল রহস্য উদঘাটনে সমর্থ হয়েছেন। কান্দাই আগমন করার পর তিনি এখানে এসে যা দেখলেন এবং বুঝলেন তাতে তার নতুন এক অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। এ দেশের মানুষ মানুষ নয় বহুরূপী। মিঃ উইকো কান্দাই এসেই জানতে পেরেছিলেন। এখানে ভীষণ এক দস্যু আছে যার ভয়ে সমস্ত কান্দাই শহর কম্পমান, সে হলো স্বয়ং দস্যু বনহুর। অবশ্য মিঃ উইকো জানতেন দস্যু বনহুর বলে এক দস্যু সম্রাট আছে যার বিচরণ পৃথিবীর সর্বত্র।

কান্দাই বিমান বন্দরে অবতরণের পর মিঃ উইকো জানতে পেরেছিলেন মিঃ নুরুজ্জামান সম্বন্ধে। বয়স কম হলেও নুরুজ্জামান এক বলিস্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। এ কথাও শুনেছিলেন। কথাটা সঠিক প্রমাণিত হয়েছিলো যখন বিমান বন্দরের বিশ্রামাগারে নূরুজামানের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন তিনি।

ওকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন মিঃ উইকো কারণ তিনি জানতেন তার মত বলিষ্ঠ দীপ্তময় পুরুষ দ্বিতীয় জন নেই। কিন্তু নুরুজ্জামান সত্যি এক বলিষ্ঠ পুরুষ যার সঙ্গে মিঃ উইকে নিজের তুলনা করতে পারলেন না। বন্ধুত্বের চেয়ে ঈর্শা ভাবটাই মনে জেগেছিলো বেশি।

আজ যখন মিঃ নুরুজ্জামানের প্রতিক্ষায় পুলিশ অফিসের বারান্দায় মিঃ হারুন এং মিঃ ইউকে দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন মিঃ হারুন নূর সম্মন্ধে আলোচনা করছিলেন। কেমন সুকৌশলে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করেছিলেন মিঃ নূর। তার বুদ্ধি দীপ্ত কার্যকলাপের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছিলেন তিনি।

মিঃ নুরুজ্জামানের সম্বন্ধে যতই শুনছিলেন মিঃ উইকো ততই তার ব্যাপারে কৌতূহলি হয়ে উঠছিলেন। সেদিন বিমান বন্দরে পরিচিত হবার পর তেমন করে আর দেখা সাক্ষাৎ লাভ হয়নি এ জন্য মিঃ উইকোর মনে বিপুল একটা উম্মাদনা ছিল।

মিঃ উইকো আজ ভালভাবে মিঃ নূরকে লক্ষ্য করেছিলেন। কিছু সময়ের আলাপ আলোচনাতেই তিনি নূরুজ্জামানকে ভালভাবে জানতে পারলেন। মিঃ নূর অল্পবয়সী হলেও তার মধ্যে রয়েছে বিরাট প্রতিভা, যা তার চেহারা এবং কথাবার্তায় প্রমাণিত হয়। মিঃ উইকো হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন মিঃ নুরুজ্জামানের বললেন–আপনার সহযোগীতা পেলে আমরা সফলতা লাভ করবো মিঃ নূর।

আরও কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা চললো তাঁদের মধ্যে তারপর সেদিনের মত যার যার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

*

. বনহুরের আস্তানার রত্মাগারের দরজা খুলে দেয়া হলো। মশালের আলোতে চক্ চক করে উঠলো রত্নাগারের মহামূল্যবান সম্পদ স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরামনি মুক্তা আর মোহরগুলি।

মিঃ আরফিনের দৃষ্টি রত্নগুহার মধ্যে পড়তেই দুচোখ তার বিস্ফারিত হলো। এতো ধন–রত্ন। তিনি কোনদিন দেখেননি, যদিও তার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাংক ব্যালেঞ্জ আছে। ইমারৎ আছে শহরে আট দশটা। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে ভরপুর সংসার। কিন্তু এমন পাকার ভাবে এ সব দেখেনি।

মিঃ আরফিন আলী থ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো রত্ন সম্ভার।

প্রচণ্ড এক ধাক্কায় বনহুর—-এর অনুচর দুজন মিঃ আরফিন আলীকে রত্নগুহায় ঠেলে দিলো। তারপর বললো একজন অনুচর–যাও আলী সাহেব এবার রত্ন গুহার সব রত্ন তোমাকে দেওয়া হলো গো গ্রাসে ভক্ষণ করতে থাকো।

অনুচর দুজন ঠেলে দিলো আলী সাহেব মানে কান্দাই মন্ত্রি বাহাদুরকে বনহুরের রত্ন গুহায়।

লৌহ দরজা বন্ধ করে দিলো ওরা।

কান্দাই মন্ত্রি বাহাদুর আরফিন আলী সাহেব বনহুরের রত্ন গুহায় বন্দী হয়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো। আজ তার মনে পড়ছে সব কথা, কি ভাবে সাধুতার মুখোশ পরে সরল সহজ জনগণের মনকে আকৃষ্ট করে নেতৃত্বের আসনে উপবিষ্ট হয়েছিলেন। কি ভাবে কলমের এক খেচায় লক্ষ লক্ষ টাকা হাতের মুঠায় এসেছে। কি করে একটি টেলিফোনের দ্বারা কঠিন কাজ সমাধা করেছেন। হয়তো অপরাধী হয়েছে মুক্ত, আর নিরপরাধী হয়েছে বন্দী। কৌশলে বহু জমি দখল করে নিয়েছেন, ন্যায্য দাবীদার যারা তারা হয়েছে গৃহহারা, আশ্রয় হারা রিক্ত। আজ মনে পড়ে মহান নেতা আলী সাহেবের আরও অনেক কথা। যে বিভাগে মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি, সেই বিভাগে ছিলো প্রচুর অর্থ, কাজেই অগাধ অর্থ আর সম্পদের মালিক হতে পেরেছিলেন তিনি।

আলী সাহেবের চিন্তায় ভাটা পড়লো।

ক্ষুধায় পেটের ভিতর মোচড় দিচ্ছে।

চোখের সামনে ভেসে উঠলো ডাইনিং টেবিলে খাদ্য সম্ভার। পোলাও, কোরমা, ফিরনী, জরদা আরও কত মূল্যবান খাবার। বয় বাবুর্চি পরিবেশন করছে, স্ত্রী এলায়িত কেশে খেতে খেতে বলছেন ওগো তুমি ফিরনী খেতে ভালবাসো আজ তোমার জন্য আমি নিজের হাতে ফিরনী বেঁধেছি। ....যত খুশি খাও.... আরফিন আলী হাত দিয়ে হাতড়াতে থাকে.... শুধু সোনা–দানা আর মণি মুক্তার প...ক্ষুধা পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ডুকরে কাঁদতে চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু কোন শব্দ গলা দিয়ে বের হলো না। স্বনামধন্য গুণিমানী আরফিন আলী হামাগুড়ি দিয়ে হাতড়িয়ে চললেন, কাঁচা মাংস পেলেও তিনি এই মুহূর্তে ভক্ষণ করতেন অথবা পচা গলিত যে কোন খাবার পেলেও তিনি বিনাদ্বিধায় গলধঃকরণ করতেন কিন্তু সোনা–দানা মণি–মাণিক্য ভক্ষণ করা যায় না..... আলী সাহেব চিৎকার করে বলে উঠলেন–ওরে কে আছিস তোরা আয় দেখে যা টাকা–কড়ি, ধন-সম্পদ, সোনা–দানা খাওয়া যায় না... এ সব দিয়ে পেট ভরে না ওরে যে ঐশ্বর্যের মোহে আমরা অন্ধ হয়ে নানা রকম কুকর্ম করি... সে অমূল্য সম্পদ কোন কাজে আসে না। আজ আমি ক্ষুধা-পিপাসায় মৃত্যু পথের যাত্রী অথচ আমার চার পাশে সোনা–দানা, মণি–মুক্তার স্তূপ রয়েছে... এক মুঠি অন্ন দাও... এক গ্লাস পানি দাও উঃ! মরে গেলাম। উঠে দাঁড়াতে যায় আলী সাহেব, অমনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। শক্ত লম্বা কিছু তার হাত স্পর্শ করলো, ভালভাবে

পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো, এতো সোনা–দানা বা মণিমুক্তা নয়। এগুলো তবে কি? আরও একটু নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলো। অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। জমাট অন্ধকার, থৈ থৈ অন্ধকার শুধু গুহামধ্যে। আলী সাহেব ভীতভাবে চিৎকার করে উঠলেন–কংকাল…নর কংকাল…বাঁচাও আমাকে, বাঁচাও তোমরা… আর আমি অন্যায় করবো না…. আপন মনে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে চললেন আলী সাহেব উদ্ভ্রান্তের মত।

কিন্তু কে সাড়া দেবে রত্ন গুহায় কেউ নেই, কোন জন–প্রাণী নেই। চারিদিকে ভয়াবহ পাষাণ প্রাচীর। সূঁচ পরিমাণ ছিদ্র নেই যে দিকে দিয়ে কোন আলো প্রবেশ করবে।

মিঃ আরফিন আলীর হাতের তলায় নর কংকালগুরো আরষ্ট হয়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে কেউ যদি আলী সাহেব এর মুখমণ্ডল দর্শন করতো তা হলে দেখতে পেতো অন্যায় যারা করেন তাদের উপযুক্ত পুরষ্কার কত ভয়াবহ। ছাই এর মত ফ্যাকাশে রক্তশূন্য তার মুখমণ্ডল। কিন্তু কে তা দেখবে বা এ বিপদ মুহূর্তে উদ্ধার করবে তাকে। স্ত্রী–পুত্র–কন্যার কথা মনে পড়ে গেলো। তাদের সুখের জন্য তাকে অনেক কু-কাজ করতে হয়েছে। অনেক নিরীহ মানুষের ক্ষতি সাধন করে অর্থ সঞ্চয় করতে হয়েছে বহু অসহায় ব্যক্তির সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে হয়েছে। তার গদির বা তার পদাধিকারবলে এসব সহজ হয়েছে তার কাছে।

মেয়ের বিয়েতে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করেছেন শুধু পার্টিতে। অলংকার ব্যয় হয়েছে প্রায় এক লক্ষ টাকা। জামাতাকে একটি নুতুন গাড়ি উপহার দিয়েছেন তার মূল্য এক লক্ষ বিশ হাজার। আরও অন্যান্য খরচ করেছেন পঞ্চাশ হাজার। তিনি মহান নেতার আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন বলেই তো এসব সহজ হয়েছিলো তার কাছে।

বড় ছেলে বিদেশে লেখাপড়া করছে। তাকে মাসে প্রায় বিশ হাজার পাঠাতে হয়। আরও দুছেলে ডাক্তারী পড়ছে, আরও এক মেয়ে কলেজে পড়ছে তাদের লেখাপড়ার ব্যাপারে মাসে প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার লেগে যায়।

এসব ছাড়াও গণ্যমান্য বন্ধু-বান্ধব রয়েছেন মাসে কম পক্ষে দুএকটা ফাংশন করতে হয় স্ত্রী বা ছেলেমেয়ের অনুরোধে। এসব না করলেই যে নয় তাতে খরচ হয় দশ থেকে বারো হাজার। দ্রব্যমূল্যের কথা চিন্তা করলে চলবে না, আভিজাত্য বজায় রাখতে হবে। এসব কারণে তাকে অসৎ পথ অবলম্বন করতে হয়েছে। শুধু

কি তিনি অসৎ পথ অবলম্বন করছেন, তার মত যারাই গদিতে আছেন তারা দুএক জন ছাড়া সবাই সম্মুখ দরজা ছাড়াও পিছন দরজার মুখোপক্ষি মানে ডান হাত ছাড়াও বাম হাতের শরণার্থী।

মিঃ আরফিন আলীর চোখের সামনে দ্রুত ভেসে চলেছে এসব দৃশ্য। স্মরন হচ্ছে আজ সব কথা। আজ এই রত্নগুহার অন্ধকূপে তিনি একা, ধুকে ধুকে মরছেন, স্ত্রী–পুত্র–কন্যা আত্মীয়–স্বজন, বন্ধু–বান্ধব কেউ আজ তার পাশে নেই। মৃত্যু ভয়াল যন্ত্রণায় মিঃ আলী সাহেব নিষ্পেষিত হচ্ছেন, কেউ নেই যে তাকে রক্ষা করতে পারে।

তীব্র ক্ষুধার জ্বালা আর হীমশীতল জমাট অন্ধকার মিঃ অরফিন আলীর নাদুস নুদুস দেহটাকে গ্রাস করছিলো। বার বার মনে পড়ছে নিজের শীততাপ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দুগ্ধ ফেনিল শয্যার কথা। উঃ কি নির্মম শাস্তি, নিয়তীর কি নির্মম পরিহাস। ডুকরে কেঁদে উঠলেন আলী সাহেব–বনহুর আমাকে তুমি একবারের জন্য ক্ষমা করে দাও! আমাকে এক মুঠি অন্ন দাও। এক বাটি পানি দাও.... মরে গেলাম... আমাকে আর শাস্তি দিওনা তোমরা। আমার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছি... আমাকে মাফ করে দাও...

মিঃ আলী সাহেবের আর্তনাদ রতুগুহার পাষাণ প্রাচীরের দেয়ালে দেয়ালে আঘাত খেয়ে প্রতিধ্বনি জাগায়...আমাকে মাফ করে দাও..... আমাকে মাফ করে দাও

এখানে আলী সাহেব যখন বনহুরের রত্নগুহার জমাট অন্ধারে মৃত্যু যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিলেন তখন পুলিশ অফিসে মিঃ হারুন, মিঃ শংকর রাও এবং মিঃ উইকোর আলাপ হচ্ছিলো।

মিঃ আরফিন আলী নিখোঁজ হয়েছেন আজ এক সপ্তাহ হলো। পুলিশমহল সমস্ত কান্দাই শহর এবং শহরতলি তন্ন তন্ন করে তদন্ত চালিয়ে চলেছেন। ডি, আই, বি, পুলিশ নানা ছদ্মবেশে শহর বন্দর এমন কি কান্দাই–এর পল্লী এলাকাতেও সন্ধান চালিয়ে চলেছে কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

শুধু পুলিশ মহল নয় কান্দাই সরকার পর্যন্ত ভীষণভাবে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠেছেন, ইতিপূর্বে স্বনামধন্য মহাননেতা মিঃ নিজাম বাহাদুরকে নিয়ে প্রশাসন বিভাগ নানা রকম ঝাটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। আজ তিনি কারাগারে আবদ্ধ।

জনগণের সঙ্গে মোনাফেকি করার শেষ পরিণতি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন মিঃ নিজাম মিয়া কারাগারে বসে।

কান্দাই সরকারের মহামান্ন স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ আজ চরমে উঠেছেন। তারা দেশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অথচ রক্ষক হয়ে ভক্ষক বিড়াল তপস্বি সেজে সরকারের গদিদখল করে নিয়ে বসে আছেন। আর জনসেবার নামে জন রক্ত শোষণ করছেন অতি কৌশলে।

এমন সব ব্যক্তি আজ স্বনামধন্য ব্যক্তির আসন লাভ করেছেন, তারা এক সময় ছিলেন দেশ ও দলের অবজ্ঞার পাত্র এবং পাত্রী। যাদের পেশা ছিলো কালোবাজারী স্মাগলারী। দেশের সম্পদ গোপনে বিদেশে পাচার করে লক্ষ লক্ষ টাকার অধিকারী হয়েছিলেন, তারাই আজ মহামান্য স্বনামধন্য এক একজন মহান নেতা। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বড় বড় বুলি আওড়ানো, ভাবে গদ গদ ভাব গম্ভীর কণ্ঠে বক্তৃতা করেন, আমরা আপনাদের ভাই, কিসে আপনাদের মঙ্গল হবে এটাই আমরা চাই, দেশ ও দশের জন্য আমরা প্রাণ দিতে পারি, করতে পারি জান কোরবান। এমনি কত মধুর বচন শোনায় মহানেতারা অথচ জন সাধারণ যদি তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যান কোন বিপদ মুহূর্তে তা হলে জান–কোরবান করেও নেতাদের ছায়া দর্শন মেলেনা। বন্দুক ধারী দারওয়ান রুখে দাঁড়ায়, খবরদার ভিতরে প্রবেশ নিষেধ।

যদি তার সঙ্গে থাকে গেট পাশ বা অন্য কোন স্বনামধন্য ব্যক্তির দেওয়া পরিচয় পত্র, তাহলে গেট হয়তো মুক্ত হলো তারপর বৈঠকখানায় প্রবেশ অধিকার চাই। তা সম্ভব হয় না অনেকের পক্ষে তখন পরিচয় পত্রে গুরুত্বের উপর নির্ভর করে, বৈঠকখানায় প্রবেশ অধিকার মিলে তখন ঘণ্টার পর ঘন্টা প্রতিক্ষা। প্রথম বেশ লাগে চোখ ঝলসানো মূল্যবান আসবাব পত্রে বৈঠকখানা জম জমাট। ফুলদানী গুলোতে বিদেশী নকল ফুল থরে থরে সাজানো। সেগুন আর মেহগনি কাঠের আবলুস রং এর সোফাসেট একটি বা দুটি সেট নয়, বেশ কয়েক সেট। দেয়ালে সোনালী বৈচিত্রময় নানা ধরণের কারুকার্য খচিত দেয়াল সেট, হয়তো বিদেশ সফল করলে উপঢৌকন এগুলো।

এক সময় দৃষ্টির বিস্ময়তার পরিসমাপ্তি ঘটে। দৃষ্টি স্থির হয় হাত ঘড়িটার দিকে অথবা দেয়ালে আটকামো বিদেশী ঘড়িটার দিকে। ললাটের রেখা গুলোতে ভাজ পড়ে, কুঁকড়ে আসে ভ্রূযুগল। হাঁপিয়ে উঠে তবু সংকুচিত ভাবে বসেই থাকে অচল পুতুলের মত। কই এততক্ষণও তো মহাননেতা এলেন না। তবে কি ভিতরে

জানানো হয়নি। একটু কেশে নিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারে, দেখা যায় বয়কে গামছা দিয়ে সোফা অথবা বলগা হরিণের মাথাটা পরিস্কার করছে। ও বলে ভীরু ভাব নিয়ে সাহেব আসবেন কি? বয় বলে সাহেব এখনও ঘুম থেকে উঠেনি।

আবার সেই, সেই প্রতিক্ষা।

পুনরায় বিস্ময়কর বস্তুগুলোকে নিরিক্ষণ দেয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলামটার শব্দে বার বার চমকে উঠা। এই বুঝি এলেন মহাননেতা, তাঁকে নিরিবিলি কিছু কথা বলবার আছে। ওনি বড় ভালোলোক, সৎ–মহৎ ব্যক্তি মঞ্চে দাঁড়িয়ে গদ গদ ভাষায় কত দরদ মাখানো কথা বলেছিলেন, জনগণের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে রুমালে চোখ মুছে ছিলেন বার বার। আজ তারই দুয়ারে এসেছে দুটো কথা জানতে, বড় বিপদে পড়েই এসেছে কিন্তু গেটেই বাধা তারপর বৈঠকখানায় প্রবেশ সমস্যা তারপর ধন্যাদেওয়া, না জানি কখন মহান নেতার ঘুম ভাঙবে।

কেটে গেলো আর দুঘণ্টা

বৈঠকখানার বারেন্দয় অথবা বৈঠকখানায়। কিংবা বাগানের আসে পাশে সান বাঁধানো চেয়ারে জমে উঠে অগণিত মানুষ, নানা কাজ নিয়ে তারা হাজির হয়েছেন জনদরদী স্বনামধন্য ব্যক্তির সঙ্গ লাভের জন্য।

সিঁড়িতে শোনা যায় ভারি জুতোর শব্দ।

বুকের ভিতরে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত হৃদপিণ্ডটা ধরাস ধরাস করতে থাকে, এই তো এবার মহান নেতার সাক্ষাৎ লাভ ঘটবে কিন্তু এতো লোক জমে উঠেছে কি ভাবে শুনবেন তিনি তার বক্তব্যগুলি।

ভাবনার দরজা বন্ধ হয়ে যায়, মহান নেতার সাক্ষাৎ ঘটে। দেহে তার অফিসে যাবার ড্রেস। পিছনে চাকরটার হাতে অফিসের ফাইল।

স্বনামধন্য ব্যক্তির আগমনে উঠে দাঁড়িয়েছে ও।

অন্যান্য সবাই উঠে দাঁড়ান।

স্বনামধন্য ব্যক্তির কারো দিকে দৃষ্টি দেবার সময় নাই। তিনি ওদিকে পায়চারী রত এক ব্যক্তির দিকে তাকাতেই বলে উঠলেন–আপনি এসে গেছেন মিঃ হক

অথবা চৌধুরী সাহেব, কিংবা জনাব আরতদার সাহেব। চলুন আমার গাড়িতে অফিসে সব কথা হবে।

ওর তখন করুন অবস্থা।

সাহস করে এগিয়ে গেলো, স্যার আমি সকাল থেকে আপনার জন্য বসে আছি....

ঘাড়টা একটু ফিরিয়ে বললেন স্বনামধন্য ব্যক্তি—— ও আপনি.... হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দুচোখ বড় করে বললেন–মোটেই সময় নাই আর একদিন সময় করে আসুন...

কিছু বলতে যাচ্ছিলো ও।

ততক্ষণে ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরেছে।

স্বনামধন্য ব্যক্তি গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ান। তার পিছনে এসে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন অগণিত সাক্ষাকারী ব্যক্তিগণ। সবাই কিছু বলতে চান, কিছু কাজ নিয়ে এসেছেন।

কেউ এসেছেন বহু দূরদেশ থেকে। কেউ এসেছেন গ্রামাঞ্চল থেকে, কেউ বা এসেছেন শহরের অপর প্রান্ত থেকে। সবার চোখেমুখেই ফুটে উঠলো হতাশার চিহ্ন।

ও নির্বাক হয়ে যায়।

ততক্ষণে গাড়িতে উঠে বসেছেন স্বনামধন্য ব্যক্তি।

গাড়ি বেরিয়ে যায়।

দারওয়ান গেট বন্ধ করে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়।

সবাই গেট বন্ধ করে দেবার পূর্বেই বেরিয়ে পড়ে। তার সঙ্গে বেরিয়ে আসে ও। ওর চোখের সামনে বেসে উঠে মহামান্য স্বনামধন্য ব্যক্তিটির আসল রূপ { মফস্বলে গিয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে গদ গদ কণ্ঠে উনারা যা বলেন তা তাদের অন্তরের কথা নয়, সব মিথ্যা ভাওতা মাত্র.....

গাড়িখানা ততক্ষণে দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে হতাশার নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ও।

এটাই হলো মহান নেতা স্বনামধন্য ব্যক্তিদের আসল রূপ। ভোট ভিক্ষা কালে এরা ভিখারীরে চেয়েও অধম, দ্বারে দ্বারে গিয়ে ধন্যা দিতে এতোটুকু লজ্জা বোধ করেনা তখন। আর এখন তাদের রূপ গেছে পাল্টে, তারা চিনেও চিনতে পারেনা– চোখে রংগিন ফানুষ।

বাছাধন মিঃ আরফিন আলী আজ রত্ন–গুহায় বন্দী হয়ে মৃত্যু সুধাপানে বিভোর, ঘোলাটে হয়ে গেছে দৃষ্টির আলো। রংগিন ফানুষ ছুটে গেছে চোখ থেকে। স্বপ্ন ভেঙে গেছে নির্মম কঠিন আঘাতে।

মৃত্যুর জন্য প্রহর গুণছেন মিঃ আরফিন আলী রত্ন গুহার স্বর্ণপে পড়ে পড়ে।

ওদিকে তার স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয়–স্বজন ফকির দরবেশের দরজায় ঘুরছেন যদি তাদের নেক দোয়ায় খুঁজে পাওয়া যায় মহান নেতাকে।

সপ্তাহের পর আর বেঁচে থাকা সম্ভব হয়না মিঃ আরফিন আলী সাহেবের। ক্ষুধা পিপাসার কঠিন নিষ্পেষণে এক সময় নিজ পাপের কথা স্মরন করে দুচোখ বন্ধ করেন।

দরজা খুলে যায় রত্ন-গুহার।

স্বয়ং বনহুর তার সঙ্গীদ্বয় রহমান এবং কায়েসকে নিয়ে হাজির হয় রত্ন গুহার দরজায়। দরজা খুলে যায়, ভিতরে আলো পড়ে সঙ্গীদ্বয়ের হস্তের মশালের আলো।

রত্ন-স্তূপের উপর উবু হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে জনগণের সেবক, জনদরদী জনাব আরফিন আলী সাহেব। মশালের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার কংকালসার দেহটা।

দেহের জামা কাপড়গুলো দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খাবার চেষ্টা করেছেন মিঃ আরফিন আলী। যার খাবার টেবিলে প্রতিদিন নানাবিধ খাদ্য সম্ভারে ভরপুর। আর সেই ব্যক্তি কিনা একমুঠি অন্নের জন্য…..

বনহুর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন।

রহমান আর কায়েস বের করে আনলো তার লাশটা।

বনহুর বললো দরজা বন্ধ করে দাও।

সর্দার লাশটা? বললো রহমান।

কান্দাই মিউজিয়ামে রেখে এসো, দেশবাসী জানুক, দেখুক ক্ষমতার অপব্যবহার যারা করেছেন তাদের পরিণতি কত সাংঘাতিক এবং যারা গদিতে সমাসীন থেকে জনগণের চোখে ধূলো দিয়ে তাদের বুকের রক্ত শুষে নিচ্ছেন সাধুতার মুখোশ পরে তাদের কারো রেহাই নাই। আজ তারা বিচারক, সরকারের মন্ত্রদাতা কিন্তু সময় যখন আসবে তখন রুখতে পারবেনা কেউ। গদি থেকে টেনে নামিয়ে আনবে সেদিন, গণআদালতে বিচার হবে কার কতখানি সৎ কর্ম রয়েছে সেই মাপকাঠিতে ওজন হবে তাদের কর্মের..... হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাসি যেন থামতে চায় না। বনহুরের।

রহমান করতালি দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে দুজন জমকালো পোশাক পরা লোক হাজির হলো সেখানে। কুর্ণিশ জানিয়ে দাঁড়াতেই রহমান ইংগিত করলো রত্ন–গুহার দিকে।

জমকালো পোশাক পরিহিত অনুচরদ্বয় প্রবেশ করলো রত্ন গুহায় এবং বের করে আনলো মিঃ আরফিন আলী সাহেবের কংকালসার মৃতদেহটা।

ওরা দুজনে বের করে নিয়ে গেলো লাশটা আস্তানার বাইরে, একটা ঘোড়ার পিঠে তুলে নিলো তারপর অদৃশ্য হলো গভীর জঙ্গলে।

*

কান্দাই মিউজিয়ামের অভ্যন্তরে একটি সোনালী খামের সঙ্গে লটকালো মিঃ আরফিন আলী সাহেবের মৃতদেহ।

মিউজিয়ামের দরজা খুলতেই প্রথমে নজরে পড়লো আলী সাহেবের চর্মঢাকা কংকালসার প্রাণহীন দেহটা। চিৎকার করে উঠলেন মিউজিয়াম রক্ষী। একটা

প্রাণফাটা চিৎকার করে বেরিয়ে এলো সে বাইরে।

যারা আসে পাশে ছিলো ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটে এলো বিস্ময় ভরা চোখে দেখলো সবাই তাদের মন্ত্রী বাহাদুর মিঃ আরফিন আলী সাহেব সোনালী খামের সঙ্গে ঝুলছেন।

সবার চোখে বিস্ময়, হৃদয়ে প্রশ্ন আলী সাহেব কি করে কান্দাই মিউজিয়ামে এলেন। কেমন করে তার এমন করুন অবস্থা হলো। কে বা কারা তাকে উধাও করেছিলো……

প্রশ্ন–প্রশ্নই রয়ে গেলো কেউ প্রশ্নের জবাব পেলো না।

অল্পক্ষণেই লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো মিউজিয়াম প্রাঙ্গন। পুলিশ অফিস থেকে ছুটে গেলেন পুলিশ কর্মকর্তাগণ।

হাজির হলেন পুলিশ সুপার।

নূরও এলো মিউজিয়ামে।

সবার চোখে মুখে ভয় বিস্ময় আর উদ্বিগ্নতার ছাপ বিদ্যমান। মিঃ আরফিন আলী সাহেবকে দেখতে এসেছে সবাই। মিঃ আরফিন আলী সাহেব একজন সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কাজেই সরকার এ ব্যাপারে ভীষণ ভাবে ঝুঁকে পড়েছিলেন। আরফিন আলী সাহের নিখোঁজ হওয়ায় কান্দাই সরকার ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। নানাভাবে তল্লাসী চালিয়েও এই মানী ব্যক্তির সন্ধান পাননি। আজ সন্ধান পেলেন কান্দাই মিউজিয়ামে, জীবন্ত নয় মৃত অবস্থায়।

প্রাণহীন কংকালসার মিঃ আরফিন আলীর জামা কাপড় দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি ক্ষুধার জ্বালায় নিজ জামা কাপড় টেনে দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিলে খেয়েছেন। শরীরের কোথাও এতোটুকু মাংস অবশিষ্ট নাই। চোখ দুটি গর্ত হয়ে কোঠেরে প্রবেশ করেছে। যেন একটি চামড়া ঢাকা কংকাল।

সমস্ত শহরে এ ব্যাপার নিয়ে একটা ত্রাসের সৃষ্টি হলো। সংবাদ পত্রে ছবি সহ প্রকাশিত হলো সংবাদটা।

কান্দাই সরকারের আসন টলে উঠলো, এমন ধরনের পরিণতি আলী সাহেবের হবে কেউ কল্পনা করতে পারেনি। কান্দাই কর্মকর্তাদের হৃদয় কেঁপে উঠলেও তারা ভীত ভাব প্রকাশ করলেন না বরং তারা আরও রক্ষির ব্যবস্থা করলেন যাতে কেউ তাদের উপর হামলা চালাতে না পারে।

ঐ যে কথায় কথায় বলে স্বভাব যায়না মরলে। তাই যারা, সরকারের মহামান্য স্বনামধন্য ব্যক্তি গদি দখল করে নিয়ে আছেন তারা মিঃ আরফিনের অবস্থা দর্শন করেও শিক্ষা লাভ করলেন না সংশোধন হলেন না। যেমন ছিলেন তেমনি রইলেন, সুযোগ এর সৎ ব্যবহার করে চললেন। তাঁদের গর্ব তারা সরকারের লোক তাই তাদের আচরণ অস্বাভাবিক, সাধারণ মানুষকে কমই গ্রাহ্য করেন কারণ ক্ষমতা তাদের হাতের মুঠোয়।

ইচ্ছা করলে তারা সব কিছুই করতে পারেন। যাকে খুশি নাকে দড়ি লাগিয়ে কলুর বলদের মত ঘোরাতে পারেন। হর্তা কর্তা বিধাতা যেন এরা। দেশটাকে কি ভাবে শোষণ করে নিজেদের ভুরি প্রান্ত করবে এটাই হলো তাদের মূল উদ্দেশ্য। সরকার প্রদত্ত ভবনে বাস করলেও শহরে এবং শহর তলিতে প্রাসাদ সমতুল্য নিজস্ব ইমারৎ গাড়ি–ব্যাংক ব্যালেন্স এসব কম নেই কারো, তবুও আরও লালসা মন যে ভরতে চায় না।

মিঃ জাফরীও নিশ্চুপ থাকতে পারলেন না, সংবাদ শুনে ছুটে এলেন এবং মিঃ আরফিনের লাশ দেখে সম্ভীত হলেন।

ঐ মুহূর্তে নূরও এসেছিলো সে নিশ্চুপ দেখতে লাগলো, সে জানে সব কিছু আর জানে বলেই চুপ রইলো। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেদিনের দৃশ্য। তার আব্বু স্বয়ং দস্যু বনহুর এর দরবার কক্ষ। অতি সুকৌশলে মায়ের কক্ষের দেয়ালের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করা হয়েছে। কেউ বুঝতেই পারবেনা মেঝের পাশে দেয়ালের মধ্য দিয়ে এমন একটা সুড়ঙ্গ পথ রয়েছে যার সন্ধান তার মা মনিও জানে না।

দোতলার দেয়ালের পাশে সুন্দর একটি সুড়ঙ্গ মুখ।

সে যা ভেবেছিলো তাই, মায়ের ঘরে কি করে তার আব্বু প্রবেশ করে এরই সন্ধান করতে গিয়ে সে খুঁজে পেয়েছে নতুন পথ।.....

মিঃ হারুন উপস্থিত ছিলেন তিনি বললেন–মিঃ নূর কি ভাবছেন? একটু হেসে বললো নূর মিঃ আলী সাহেবের শেষ পরিণতি আমার মনে ভীষণ একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

মিঃ হারুন বললেন–এ হত্যাকাণ্ড বড় রহস্যময় এবং সে রহস্য আপনি ইচ্ছা করলে উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হবেন।

আমি চেস্টার ত্রুটি করছিনা স্যার। বললো নূর।

মিঃ ইউকোও উপস্থিত ছিলেন, তিনি বললেন যেমন করে হোক মিঃ আরফিন আলী সাহেবের হত্যার গোপন রহস্য উদঘাটন করতে হবে এবং যারা তাকে এভাবে হত্যা করেছে তাদের খুঁজে বের সরে সমুচিত শাস্তি প্রদান করতে হবে।

মিঃ হারুন বললেন, এ কাজ এমন কেউ করেছে যাকে খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন।

মিঃ ইউকো বললেন, স্যার আমরা যেভাবে তদন্ত শুরু করেছি তাতে হত্যাকারীকে অচিরেই গ্রেপ্তার করতে পারবো বলে আশা করছি।

নূর রুমালে ঘাম মুছলো।

মিঃ আলীর হত্যা রহস্য নিয়ে কান্দাই সরকার ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সরকার চান দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, দেশের জনগণ সুখে বসবাস করুক কিন্তু সরকারের কর্মকর্তাগণ স্বজনপ্রীতি আর ক্ষমতার দৌরাত্মে দেশ ও দশের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। যদিও সরকার। এই সব কর্মকর্তাদের পেছনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছেন তবু তারা সন্তুষ্ট নন আরও লোভ আরও লালসা কেমন করে ঐশ্বর্যের ইমারৎ গড়বেন।

নূর যখন রুমালে মুখ মুছলো তখন পুলিশ সুপার স্বয়ং তার মুখোভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। এবার তিনি এলেন নূরের পাশে বললেন, মিঃ নূর দেশে যে অনাচার চলেছে, আমরা প্রশাসন বিভাগ তা আয়ত্বে আনতে পারছি না কারণ দেশের অনাচার অবিচার অন্যায়ের প্রশ্রয় দাতা দেশের কর্তকর্তাগণ। তারা সবাই না হলেও কিছু সংখ্যক রয়েছে যারা নিজেরাও অসৎ কাজে লিপ্ত। মিঃ আলী সাহেব তাদেরই একজন ছিলেন... কথাগুলো অতি চাপা কণ্ঠে বললেন পুলিশ সুপার।

পুলিশ সুপারের কথাগুলো নূরকে মুগ্ধ করলো কারণ তিনি প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তার মুখে এমন কথা শুনবেন আশা করেননি। সে জানে প্রশাসন বিভাগে যারা কাজ করেন তারা স্পষ্টভাষী হতে পারেন না। এমন কি চাকুরি হারানোর সম্ভাবনায় মুখেও আসতে দ্বিধা বোধ করেন।

এ ব্যাপারে কান্দাই পুলিশ সুপারকে অন্তরের অর্থ দিয়ে ধন্যবাদ জানায় নূর।

*

জাভেদ আজ ইন্দ্র।

সে ভুলে গেছে নিজের অস্তিত্ব। কে সে? কোথায় তার জন্ম কিছুই তার স্মরণ নাই। সন্ন্যাসী জ্যোতিষীর মহাঔষধে তার সব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে।

হুমায়রার সঙ্গে জাভেদের যেন গভীর সম্বন্ধ গড়ে উঠে এটাই সন্ন্যাসীর ইচ্ছা। ইন্দ্রনাথকে সে আপন করে নিয়েছে শুধু এই জন্য।

জ্যোতিষী ইন্দ্রকে নিয়ে প্রতিদিন বের হয় সন্ধান করে ফেরে সাত মানিক সম মহামূল্যবান সম্পদটির। গণনা করে জানতে পারে সে সম্পদ এখন দস্যুরাণীর হস্তে।

জ্যোতিষী সন্নাসীর মাথায় আগুন ধরে যায়, এই সম্পদ তার চাই।

হুমায়রার কিন্তু মায়া বসে গেছে ইন্দ্রনাথের উপর। ওকে ছাড়া সে এক দণ্ড বাঁচতে পারেনা। সব সময় ইন্দ্রকে নিয়ে তার জল্পনা–কল্পনা। হুমায়রার বয়স একেবারে কম নয়। তার দেহ মনে রঙিন স্বপ্নের নেশা। অবশ্য এটা বয়সের তারতম্য। মন চায় চঞ্চল হরিণীর মত নেচে গেয়ে বেড়ায়। সারাটা দিন বনে বনে বিচরণ করে। সঙ্গী পেতে চায় সে ইন্দ্রনাথকে কিন্তু ইন্দ্রনাথের মধ্যে সে খুঁজে পায় না তার পাওয়ার বস্তু। মাঝে মাঝে হুমায়রার মন অভিমানে ভয়ে উঠে, ঠিকমতো খেতেও দেয়না সে ইন্দ্রনাথকে। হুমায়রা দেখতে চায় সে তার কাছে খেতে চায় কিনা।

সেদিন সন্ন্যাসী বাবাজী কোথাও গিয়েছিলেন কোন কাজে। হুমায়রা ছিলো একা।

সকাল থেকে ইন্দ্রনাথ তার অশ্ব জাম্বুকে নিয়ে বেরিয়েছে। কোথায় গেছে জানে না হুমায়রা, মাঝে মধ্যে সে এমনি করে তার অশ্ব নিয়ে বেরিয়ে পড়তো কাউকে কিছু না বলে।

সন্ন্যাসী বাবাজী প্রথম প্রথম ভীষণভাবে ঘাবড়ে গিয়েছিল। তারপর যখন দেখলো ইন্দ্রনাথ যেখানেই যাক আবার সে ফিরে আসে।

তাই সন্নাসী জ্যোতিষী তেমন করে উদ্বিগ্ন হতো না বা হয়না আর।

জাম্বু অদ্ভুত অশ্ব।

যেমন তার চেহারা তেমনি কার্যকলাপ। একমাত্র ইন্দ্রনাথ ছাড়া জাম্বুকে ঠিক রাখতে এমন লোক বুঝি পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আর নাই।

সন্ন্যাসী জ্যোতিষী একদিন সখ করে জাম্বুর শরীরে হাত বুলিয়ে আদর করতে গিয়েছিলো। সন্ন্যাসীর প্রতি জাম্বুর বুঝি রাগছিলো, হয়তো বা সে বুঝতে পেরেছিলো তার প্রভূকে জ্যোতিষী মহাঔষধ পান করিয়ে সংজ্ঞা লুপ্ত করে দিয়েছে। তাই জাম্বু ভীষণভাবে আক্রমণ করেছিলো, কামড়ে ধরেছিলো জ্যোতিষীর দেহের চামড়া, ছিঁড়ে নিয়েছিলো কিছু চুল। জ্যোতিষী এর পর থেকে আর কোন সময় ইন্দ্রনাথের অশ্বের ছায়া মাড়াতো না।

পশু হলেও ইন্দ্রনাথের অশ্বের সংজ্ঞা ছিলো অনেক বেশি তাই সে প্রভুকে ত্যাগ করে কোথাও যেতো না।

ইন্দ্রনাথ প্রায়ই জাম্বুকে নিয়ে বের হতো, কোথায় যেতে–কেন যেতো সেই জানে। যেমন হঠাৎ চলে যেত তেমনি আচম্বিতে ফিরে আসতো।

আজও ইন্দ্রনাথ যখন ফিরে এলো তখন জ্যোতিষী কুঠিরে ছিলো না।

হুমায়রা প্রতিক্ষা করছিলো, কোথায় গেলো ইন্দ্রনাথ ভাবছিল সে গভীর ভাবে। মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছিলো কুঠিরের বাইরে। রাগ অভিমানে ভরে উঠছিলো ওর মন। ইন্দ্রটা যেন কি একটুও ভাবেনা তার কথা।

ঝরণার ধারে গিয়ে পাথরের টিলার উপরে বসতো সে পা ঝুলিয়ে। সচ্ছ পানিতে তার নিজ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হতো, হুমায়রা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে

নিজের ছবি। অহংকারে মন তার ভরে উঠে, এতরূপ তার। সে যেন একটি বনফুল।

গলায়, হাতে, বাজুতে ফুলের মালা বেঁধে খোঁপায় ফুল খুঁজে ভাবতো এতোরূপ তার তবু সে ইন্দ্রনাথকে মুগ্ধ অভিভূত করতে পারছে না। ইন্দ্রনাথ কি অন্ধ, তার দৃষ্টি কি অসার, হুমায়রার বুকটা কেমন যেন জ্বালা করে উঠে।

আজ হুমায়রা বন থেকে একরাশ ফুল তুলে এনেছে। সুন্দর করে মালা গেথে খোঁপায়, গলায়, হাতে পরেছে। কপালে পরেছে চন্দনের টিপ্।

জ্যোতিষী আজ বাড়ি নাই।

হুমায়রার তাই খুশির অন্ত নাই, ইন্দ্রনাথ কে সে আজ কাছে পাবে, নানা কথায় হাসিগানে ভরিয়ে তুলবে বনভূমি। কিন্তু ইন্দ্রনাথ কোথায়।

মনটা ওর হাঁপিয়ে উঠলো।

বেরিয়ে পড়লো, হুমায়রা চঞ্চল হরিণীর মত। নিজ কুঠির ছেড়ে অনেক দূর চলে এলো সে। বনের মধ্যে ওকে সে খুঁজে ফিরতে লাগলো।

হঠাৎ কান পেতে শুনতে পেলো দূরে বহুদূরে অশ্ব পদশব্দ।

হুমায়রার মন খুশিতে ভরে উঠলো, নিশ্চয়ই ইন্দ্র ফিরে আসছে। একটু পরেই সে এসে পড়বে তার পাশে। ওর কথা ভাবতেই হুমায়রার মনটা আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠে। অন্যান্য দিনের মত আজও তার মুখ মণ্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হলো।

প্রতিক্ষা করতে লাগলো হুমায়রা। ইন্দ্রনাথের অশ্ব পদ শব্দ ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হতে আরও স্পষ্ট হয়ে আসছে।

হুমায়রা পথের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

একটি ঝোঁপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দেখতে লাগলো ইন্দ্রনাথ কি করে।

অধিক আগ্রহে আত্মগোপন করে আছে হুমায়রা। দৃষ্টি তার পথের দিকে।

এ পথ হিংস্র পশুদের অনাগোনার পথ।

মাঝে মধ্যে এ পথে সন্ন্যাসী জ্যোতিষী চলাফেরা করে থাকে। কখনও কখনও হুমায়রাও চলে এ পথে।

ইন্দ্রনাথ তার অশ্ব জাম্বুকে নিয়েও জঘু পর্বতের দিকে চলে যায়।

হুমায়রা চুপটি মেরে অপেক্ষা করছে ঝোঁপটার মধ্যে।

এগিয়ে আসছে অশ্বপদ শব্দ।

অতি নিকটে আসতেই হুমায়রার দৃষ্টি পড়লো বন পথটার দিকে।

বিস্ময়ে চমকে উঠলো হুমায়রা।

দেখলো ইন্দ্রের সমস্ত দেহ রক্তে ভেসে যাচ্ছে! চলে গেলো ইন্দ্রনাথ তার অশ্ব নিয়ে কুঠিরের দিকে।

দৌড়িয়েও পথ যেন শেষ হতে চায়না হুমায়রার। ইন্দ্রনাথকে এভাবে দেখবে ভাবতে পারেনি সে। এখন সে মর্মাহত হলো, কেন সে কুঠির ছেড়ে দূরে চলে এসেছিলো।

উঠি পড়ি করে দৌড়াতে লাগলো হুমায়রা।

কুঠিরে পৌঁছে দেখলো অশ্ব জাম্বু কুঠিরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর দেহের কিছু অংশে রক্তের ছাপ লেগে আছে।

হুমায়রা ছুটে গেলো কুঠিরের মধ্যে।

কুঠিরে প্রবেশ করে বিস্ময়ে স্তব্ধ হলো, দেখলো হুমায়রা মেঝেতে পড়ে আছে ইন্দ্র তার দেহ দিয়ে রক্ত ঝরছে।

হুমায়রা ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ইন্দ্রনাথের বুকে। এ তোমার কি হয়েছে ইন্দ্র এ তোমার কি হয়েছে....

ইন্দ্রনাথ যন্ত্রণায় ছটফট করছিলো, সে শুধু বললো–হুমায়রা আমার দেহে বিষপূর্ণ বর্শা নিক্ষেপ করা হয়েছিল,... সমস্ত দেহে রক্তে বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে

শীঘ্র আমাকে ঔষধ দাও.... ইন্দ্রনাথ জানতো হুমায়রা এমন কোন ঔষধ জানে যার দ্বারা কঠিন মারাত্মক বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়।

ইন্দ্রনাথের চিন্তাধারা মিথ্যা নয় হুমায়রা জ্যোতিষীর কাছে এমন অনেক কিছু শিখেছিলো যে ঔষ দ্বারা কঠিন কঠিন রোগ মুক্ত হয় এবং বহু অলেকিত ঘটনার সূত্রপাত হয়।

হুমায়রা তাড়াতাড়ি আঁচলে ইন্দ্রনাথের শরীরের রক্ত মুছে দিতে লাগলো। দেখলো কাঁধের পাশে ভীষণ একটি ক্ষত। ঐ ক্ষত দিয়েই রক্ত পাত হচ্ছিলো।

এবার হুমায়রা মুহূর্ত বিলম্ব না করে ঔষধ আনতে ছুটলো। অদ্ভুত সে গাছ, তারই শিকড় তুলে নিয়ে পাথরে বেটে ক্ষত স্থানে লাগাতে হবে এবং রস খাওয়াতে হবে।

ইন্দ্রনাথ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলো।

তার দেহ ক্রমে রক্ত শূন্য হয়ে আসছে। দেহের অবশিষ্ট রক্ত জমে কালো হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

প্রতিদিন ইন্দ্রনাথ যেমন বের হয় তেমনি সে আজও বেরিয়ে ছিলো। তার অশ্ব জাম্বুকে নিয়ে চষে ফিরতে গোটা বনভূমি, এটা তার অভ্যাস। জাম্বুকে নিয়ে জন্ধু পর্বতেও আরোহন করতে ইন্দ্রনাথ।

ইন্দ্রনাথের এটা অভ্যাস, সকালে অশ্ব নিয়ে বেরুতেই হবে তার, নইলে যেন সময় কাটতে চায়না ওর। অন্যান্য দিনের মত আজও ইন্দ্রনাথ তার অশ্ব নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলো। আজ ইন্দ্রনাথ দিক হারার মত চললো, যখন ও জঙ্গল পেরিয়ে বহুদূর এসে পড়েছে সেই মুহূর্তে আচম্বিতে একটি বর্শা এসে বিদ্ধ হলো তার বাম কাঁধে।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রনাথ সমস্ত শরীরে একটা ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভব করলো। সে বুঝতে পারলো বর্শায় বিষ লাগানো রয়েছে।

ইন্দ্রনাথ ডান হস্তে বাম কাধ থেকে বর্শাখানা তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো দুরে।

হু হু করে তাজা রক্ত বেরিয়ে এলো ইন্দ্রনাথের শরীর থেকে। জাম্বুর শরীর বেয়ে ইন্দ্রনাথের রক্ত গড়িয়ে পড়লো। সমস্ত শিরা উপশিরা যন্ত্রণায় জ্বালা করে উঠলো। ইন্দ্রনাথ অশ্ব পৃষ্ঠ থেকে অবতরণ না করে ফিরে চললো জ্যোতিষীর কুঠির অভিমুখে। সে জানতো সন্ন্যাসী জ্যোতিষী এমন ঔষধ জানে যা খেলে সে ভালো হবে বা হতে পারবে। তাই ইন্দ্রনাথ সোজা অশ্ব ছুটিয়ে চলে এলো বনে জ্যোতিষীর কুঠিরে।

কুঠিরের মেঝেতে পড়ে ছট ফট করছে ইন্দ্রনাথ।

হুমায়রা চলে গেছে ঔষধের সন্ধানে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো হুমায়রা তার হাতে কিছু শিকড় এবং পাতা রয়েছে। দ্রুত হস্তে পাতা এবং শিকড়গুলো পাথরে পিষে নিয়ে রসটা সেই ইন্দ্রনাথকে খাইয়ে দিলো এবং ক্ষতস্থানে প্রলেপ লাগিয়ে দিলো। তারপর হুমায়রা বসলো ইন্দ্রনাথের পাশে, চোখেমুখে ওর উদ্বিগ্নতার ছাপ।

ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলো হুমায়রা–ইন্দ্র তোমার একি হলো? কেন তুমি গিয়েছিলো বন্ধু?

হুমায়রা ইন্দ্রনাথকে সময় সময় আদর করে বন্ধু বলে ডাকতো। এ ডাকে একটা মধুর সম্বন্ধ গড়ে উঠার কথা কিন্তু তা হয়নি।

ইন্দ্র হয়তো বন্ধু ডাকে ফিরে তাকাতো কিন্তু তার মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হতোনা। হুমায়রা কিন্তু অভিভূত হয়ে যেতো, ইন্দ্রনাথ তার বড় প্রিয় ছিলো।

হুমায়রার কথায় ইন্দ্রনাথ কোন জবাব দিলো না, দুচোখ মেলে তাকালো সে হুমায়রার মুখের দিকে। যন্ত্রণায় তার মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।

হুমায়রা ওর মাথাটা তুলে নিলো কোলে।

চুলে হাত বুলিয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে আবার ডাকলো সে–বন্ধু.....

এবার ইন্দ্রনাথ চোখ মেললো না।

শুধু তার মুখ দিয়ে একটা যন্ত্রণাদায়ক শব্দ বের হচ্ছিলো–উঃ, উঃ, আঃ, আঃ.....

হুমায়রা ওর ললাটে বুকে হাত বুলিয়ে চললো, ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো ইন্দ্রনাথের ললাটের উপর।

ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলো আবার সে–ইন্দ্রনাথ তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে একটু ধৈর্য ধরা বন্ধু এক্ষুণি তোমার সব কষ্ট লাঘব হবে। তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

ইন্দ্রনাথ একবার চোখ মেললো।

দেখতে পেলো সে হুমায়রাকে, ব্যাকুল উদ্বিগ্ন দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে সে তার যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে।

ধীরে ধীরে চোখ মুদে আসছিলো ইন্দ্রনাথের।

হুমায়রার বুকটা কেমন ধক্ করে উঠলো। তার ঔষধ বুঝি ব্যর্থ হয়েছে, ইন্দ্রনাথ বুঝি শেষ হয়ে এলো। তাই সে ওর মুখখানা তুলে ধরে নিজের চিবুকে ওর চিবুক স্পর্শ করিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

হুমায়রার মন অস্থির হয়ে উঠলো। সে অত্যন্ত চিন্তিত এবং ভীতভাবে তাকিয়ে দেখলো ইন্দ্রনাথ ক্রমান্বয়ে নীরব হয়ে আসছে। সে ভাবলো আর ওকে রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব হলো না। এবার হুমায়রা ইন্দ্রনাথের মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে রাখলো নিচে তারপর সে বেরিয়ে গেলো কুঠির থেকে।

একবার তাকিয়ে দেখলো আকাশটার দিকে।

মেঘ শূন্য আকাশটার কিছু নজরে আসছে, তবে সম্পূর্ণ দৃষ্টি গোচর হয়না ঘন বৃক্ষশাখায় আকাশের বেশির ভাগ অংশ ঢাকা পড়ে গেছে। তবু হুমায়রা আকাশটার দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবতে থাকে। সত্যি যদি ইন্দ্রনাথ মারা যায় তাহলে...... না না ইন্দ্রনাথকে সে কিছুতেই মরতে দেবেনা। দ্রুত ফিরে এলো হুমায়রা কুঠিরটির মধ্যে।

ইন্দ্রনাথের মুদিত আঁখিদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে তার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। ও যে ইন্দ্রনাথকে প্রাণাধিক্য মনে করে।

হুমায়রা এসে বসলো ইন্দ্রনাথের পাশে।

মাথাটা রাখলো ওর বুকের উপর। ইন্দ্রনাথের বুকের স্পন্দন অনুভব করতে লাগলো হুমায়রা।

ঠিক এমন সময় কেউ যেন কাঁধে হাত রাখলো তার।

হুমায়রা চোখ তুললো ব্যস্ততার সঙ্গে।

দেখলো তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে সন্ন্যাসী জ্যোতিষী। তার হাতে লৌহ ত্রিশূল এবং বাম হাতখানা হুমায়রার কাঁধে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি ইন্দ্রনাথের মুখে সীমাবদ্ধ।

হুমায়রা উঠে দাঁড়ালো ক্ষিপ্রগতিতে। দুহাতে জ্যোতিষীর একখানা হাত চেপে ধরে ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে বললো পিতা আমার ইন্দ্রকে আর বাঁচাতে পারলাম না.... ওকে শত্রু বিষ বর্শা নিক্ষেপ করে আহত করেছিলো....

তুমি তাকে....

হাঁ পিতা আমি তার ক্ষতস্থানে বিষনাশক মহাঔষধ লেপন করে দিয়েছি।

তাহলে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো বৎস। ইন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবে স্থির কণ্ঠে কথাগুলি বললো সন্ন্যাসী বাবাজী।

কিন্তু ও যে ক্রমান্বয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো।

তোমার ঔষধ প্রয়োগে যদি ত্রুটি না হয়ে থাকে তাহলে ভয়ের কারণ দেখছিনা।

আমার মন কেমন যেন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে পিতা?

বলেছিতে তোমার ঔষধে যদি ভুল হয়ে না থাকে তাহলে ভয়ের কোন কারণ নেই। আচ্ছা আমি দেখছি..... যাও তুমি বিশ্রাম করোগে।

হুমায়রা পাশের কুঠিরে চলে গেলো।

জ্যোতিষী বাবাজীর কথা সে অমান্য করার সহাস পেলো না। যাবার সময় ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে হুমায়রা স্বকরুণভাবে তাকিয়ে দেখে নিলো একবার।

সত্যি সমস্ত দিন ধরে তার ভীষণ পরিশ্রম হয়েছে। বড় ক্লান্ত বোধ করছিলো হুমায়রা। এখন জ্যোতিষী বাবাজী ফিরে আসায় একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে। যদিও সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারলো না কারণ ইন্দ্রনাথ এখনও সংজ্ঞাহীন।

এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো হুমায়রা।

সে স্বপ্ন দেখছে ইন্দ্রনাথ হাস্যোজ্জলদ্বীপ্ত মুখে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে বলছে সে–এসো হুমায়রা। চলো যাই অনেক দূরে, ঐ নীল আকাশে যেখানে হালকা মেঘগুলো ভেসে বেড়ায় পাল তোলা নৌকার মত। যাবে হুমায়রা আমার সঙ্গে। হুমায়রা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়, হাতে হাত রাখলো সে ইন্দ্রনাথের। হাসছে ইন্দ্রনাথ, সে হাসি বড় মিষ্টি বড় মধুর, বড় অপরূপ। হুমায়রা আর ইন্দ্রনাথ ববরিয়ে আসে সেই সুন্দর মনোরম কক্ষ হতে। ইন্দ্রনাথ ওর হাত ধরে এগিয়ে চলে, হাল্কা মেঘের মত উড়ে উড়ে। সম্মুখে অপূর্ব আলোকরশ্মি তারার মালা, ফুলের কুঁড়ি। পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় শূন্য আকাশে, নীল শুধু নীলের সমারোহ। ডানা মেলে ওরা দুজনে উড়ে বেড়ায়।

এত আনন্দ বুঝি আর জীবনে কোনদিন হুমায়রা পায়নি। হাসি খুশি আর আনন্দ শুধু আনন্দ। মেঘের ফাঁকে ওরা লুকোচুরি খেলে। ইন্দ্রনাথ এক সময় লুকিয়ে পড়ে কোন মেঘের আড়ালে, হুমায়রা ওকে খুঁজে পায়না। চিৎকার করে ডাকে হুমায়রা……ইন্দ্র! আমার ইন্দ্র কোথায় তুমি…ই…. আমার ইন্দ্র…..এসো…এসো… বন্ধু….আমি তোমাকে খুঁজে পাচ্ছিনা…..কোথায় তুমি….ইন্দ্র আমার, ইন্দ্র….।

ঠিক ঐ মুহূর্তে ঘুম ভেঙে গেলো হুমায়রার। কোথায় ইন্দ্রনাথ, চারিদিকে অন্ধকার।

হুমায়রা ভাবছে সে এখন তার নিজের কুঠিরে শয়ন করে আছে পাশের কুঠিরে ইন্দ্রনাথ সংজ্ঞাহারা অবস্থায় রয়েছে, পাশে রয়েছে জ্যোতিষী বাবাজী।

শয্যাত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো হুমায়রা।

অতি লঘু পদক্ষেপে পাশের কুঠিরে উঁকি দিলো সে। দেখলো সন্ন্যাসী বাবাজী ইন্দ্রনাথের শিয়রে দণ্ডায়মান অবস্থায় বিড় বিড় করে কিছু পাঠ করছে। তার হাতে একটি দণ্ডাকৃত বস্তু রয়েছে।

হুমায়রা বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। সন্ন্যাসী বাবাজী হাতের বস্তু নিয়ে বা দণ্ডাকৃত ছড়িটা নিয়ে নাড়ছে।

নিশ্চয়ই বহুক্ষণ কেটে গেছে।

এখন রাত। গভীর রাত।

চারদিকে থমথমে নিস্তব্ধতা।

ঝিঁঝির একটানা শব্দ আজ তেমন শোনা যাচ্ছেনা। অন্যান্য রাতে ঝিঁঝির অশান্ত আওয়াজে কান ঝালাপালা করে উঠে, মাঝে মাঝে শোনা যায় হিংস্র জীব–জন্তুর হুঙ্কার। আজ বড় নীরব লাগছে। হুমায়রা অতি সতর্কতার সঙ্গে দেখতে লাগলো কি করে সন্ন্যাসী বাবাজী।

সন্ন্যাসী বাবাজী তখনও দণ্ডটি নাড়ছে এবং বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ করছে। হঠাৎ বলে উঠে সন্ন্যাসী বাবাজী–হুমায়রা এসো।

হুমায়রা অতি সতর্কতার সঙ্গে আড়ালে আত্মগোপন করে দেখছিলো। অকস্মাৎ সন্ন্যাসী বাবার কণ্ঠস্বরে চমকেই শুধু উঠলো না হুমায়রা, ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়লো।

সন্ন্যাসী স্থির শান্ত কণ্ঠে বললো অহেতুক ভয় পাবার কোন কারণ নেই এসো।

হুমায়রা ভাবছিলো সে লুকিয়ে লুকিয়ে সন্ন্যাসী বাবাজীর কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলো কিন্তু কি করে সন্ন্যাসী বাবা জানতে পারলো সে আড়ালে আত্মগোপন করে আছে। নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী বাবাজী গণনা করে জানতে পেরেছে। হুমায়রা লজ্জানত মস্তকে ধীরে পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালো সেখানে।

বললো সন্ন্যাসী বাবাজী–জানি তুমি আশ্চর্য হচ্ছে হুমায়রা। কেন আমি এতোরাতে এভাবে ইন্দ্রকে নিয়ে জেগে আছি।

হুমায়রা চোখ তুলে তাকিয়ে সন্ন্যাসী বাবাজীর মুখখানা একবার দেখে নিলো। হাস্যোজ্জ্বলদ্বীপ্ত সে মুখ, কোথাও এতোটুকু বিরক্তির ছাপ নাই আশ্বস্ত হলো হুমায়রা

সন্ন্যাসী বাবা এবার বললো–তুমি বড় চিন্তিত হয়েছে হুমায়রা, কিন্তু আর তোমাকে ভাবতে হবে না। কারণ ইন্দ্রনাথ শিঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে।

সত্যি বাবাজী? ব্যাকুল কণ্ঠে বললো হুমায়রা।

বললো সন্ন্যাসী বাবাজী–হা সত্যি ইন্দ্রনাথ সুস্থ আছে। সে এক্ষুণি জ্ঞান লাভ করবে।

বাবাজী! হুমায়রার চোখ দুটো আনন্দ ছল ছল করে উঠলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ইন্দ্রনাথ চোখ মেলে তাকালো।

হুমায়রা ভুলে গেলো সন্ন্যাসী বাবাজীর উপস্থিতি। সে ঝাঁপিয়ে পড়লো ইন্দ্রনাথের বুকে, কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে বললো–ইন্দ্র তুমি বেঁচে গেছে! তুমি বেঁচে গেছো… আবেগে ভরে উঠে হুমায়রার কণ্ঠস্বর।

সন্ন্যাসী-বাবাজীর মুখে ফুটে উঠে একটা স্মিত হাসির রেখা, বেরিয়ে যায় সে কুঠিরের মধ্য হতে। ইন্দ্র আর হুমায়রার মিলনই তার কাম্য। ইন্দ্রনাথকে তার নিতান্ত প্রয়োজন এবং সে কারণেই জ্যোতিষী চায় হুমায়রার বন্ধনে আবদ্ধ হোক সে। জ্যোতিষীর চিন্তাধারা কতখানি সত্য হবে তা সে জানেনা।

হুমায়রা ইন্দ্রনাথের কণ্ঠ বেষ্টন করে গভীর আবেগে ডাকলো–ইন্দ্র তুমি আমার! কেউ তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না! মৃত্যুদূতও পারবে না….

ইন্দ্র নীরবে বার দুই চোখ মেলে তাকালো।

হুমায়রা ওর বুকে মাথা রেখে বললো–ইন্দ্র কথা বলো, কথা বলো তুমি….

*

কদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সেরে উঠলো ইন্দ্রনাথ।

হুমায়রার মুখে হাসি আর ধরে না।

খুশিতে উচ্ছল সে।

ইন্দ্রনাথকে হুমায়রা আরও গভীর ভাবে কামনা করে। ওর ভালবাসাই যেন তার জীবনে পরম পাওয়া কিন্তু ইন্দ্র পূর্বের মত স্বাভাবিক, সে যেমনটি ছিল তেমনটিই আজ রয়েছে। হুমায়রাকে পাশে পেলেও সে তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে কাছে টেনে নেয় না, শুধু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নির্বাক দৃষ্টি নিয়ে।

হুমায়রা কখনও ফুল নিয়ে মালা গাঁথে, সেই মালা এনে আচম্বিতে পিছন হতে পরিয়ে দেয় ইন্দ্রনাথের গলায়।

ইন্দ্রনাথ শুধু হাসে মিষ্টি একটু হাসি।

ওর চোখে মুখে কোন উম্মাদনা নেই, নীরব একটি পাথর মূর্তি যেন ইন্দ্রনাথ।

সেদিন জ্যোতিষী ইন্দ্রনাথসহ বেরিয়ে পড়লো কুঠির থেকে। আজ জ্যোতিষী আর ইন্দ্রনাথ পায়ে হেঁটে এগুতে লাগলো। বন-জঙ্গল পেরিয়ে প্রান্তর, তারপর প্রান্ত পেরিয়ে আবার বন তারপর সমুদ্র।

সমুদ্র তীরে এসে দাঁড়ালো ওরা দুজনা।

ওদের সঙ্গে খাবার, কিছু ফলমূল আর পানি। সমুদ্র তীরে বসে পান আহার করলো তারা। জ্যোতিষী তুলে দিলো ওর হাতে কয়েকটি ফল–নাও বস বেশি করে খাও শক্তি বাড়াতে হবে।

হেসে বললো ইন্দ্রনাথ যথেষ্ঠ খেয়েছি শক্তিও কম নেই বলুন জ্যোতিষী বাবাজী এখন কি করতে হবে।

জ্যোতিষী বাবাজী বললো–ঐ যে সমুদ্রের ওপারে একটি দ্বীপ আছে ঐ দ্বীপে তোমাকে যেতে হবে অবশ্য আমিও তোমার সঙ্গে থাকবে।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব? বললো ইন্দ্রনাথ।

সন্ন্যাসী বললো–আমি বাহনের জন্য নৌকা তৈয়ার করে নিচ্ছি।

ইন্দ্র নিশ্চুপ শুনলে মাত্র কোন উত্তর দিলো না।

সন্ন্যাসী জ্যোতিষী সমুদ্র তীরে এক ধরনের বৃক্ষছিলো যা বালুকারাশি অথবা মরুভূমির মধ্যে জন্মে তাই দিয়ে একটা চলমান যান তৈরি করে ফেললো অল্পক্ষণের মধ্যে।

অবশ্য ইন্দ্রনাথকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে হলে সর্বতোভাবে।

দা এবং দড়ি জ্যোতিষীর কাঁধে ঝোলার মধ্যে ছিলো।

এবার যানটি সমুদ্রে ভেসে উঠে পড়লো। সমুদ্রের ভয়াল তরঙ্গে ভেসে চললো যানটি।

মাথার উপরে নীল আকাশ।

চারপাশে থৈ থৈ পানি।

ইন্দ্রনাথ ও জ্যোতিষী দাঁড় টানতে লাগলো।

এক সময় সূর্যাস্তের শেষ রশিটুকু বিলিন হয়ে গেলো। পূর্বাকাশে উঁকি দিলো পূর্ণিমার চাঁদ। ঠিক যেন একটি রূপালী থালা সমুদ্র গর্ভ হতে উঁকি দিচ্ছে, অপূর্ব সে দৃশ্য।

ইন্দ্রনাথ আর জ্যোতিষী আপন মনে দাঁড় টেনে চলেছে। প্রচণ্ড প্রচণ্ড ঢেউগুলি ডানটিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কোথায় যাবে জ্যোতিষী জানেনা ইন্দ্রনাথ। কোন প্রশ্নও করার মত অভিরুচি নেই তার। সুদর্শন জাভেদ আজ ইন্দ্রনাথ দেব দূত না হলেও দেবরাজের মত তার চেহারা, তেমনি তার আচরণ। পূর্বের যে চঞ্চলতা এখন অনেক কমে এসেছে, তবে অস্থিরতা একটুও হ্রাস পায়নি। স্বাভাবিক জ্ঞান তার আছে তবে পূর্বের স্মৃতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে তার।

কেমন যেন খেয়ালী হয়ে পড়েছে।

দাঁড় টেনে চলছিলো ইন্দ্রনাথ।

অপর-পাশে বসে দাঁড় টানছে জ্যোতিষী, তার চোখ দুটো ইন্দ্রনাথের মুখে বারবার এসে পড়ছিলো। যেমন করে তাকাচ্ছিলোসে সমুদ্রের প্রচণ্ড প্রচণ্ড ঢেউগুলির দিকে।

আকাশ আর সমুদ্র এক হয়ে গেছে যেন। কোথাও এতোটুকু কালিমা নেই। থৈ থৈ জলরাশির উপর জ্যোছনার আলো মনোরম লাগছে।

তিন দিন তিন রাত কেটে গেলো।

একটি দ্বীপ নজরে পড়লো তাদের।

বললো জ্যোতিষী এ দ্বীপে বাস করে দস্যুরাণী যার কাছে আছে সেই সাত রাজার ধন অমূল্য সম্পদটি!

ইন্দ্রনাথ কোন কথা বললো না, নিশ্চুপ সে দাঁড় বেয়ে চললো।

*

দস্যুরাণী সবে মাত্র তার অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়ালো। তার শরীরে শিকারীর পোশাক। মাথায় ক্যাপ। চুল গুলো আটোসাটো করে ক্যাপের ভিতরে গুছিয়ে রাখা হয়েছে, একটা কালো রুমাল দিয়ে কণ্ঠদেশে বেষ্টন করে জড়ানো।

দস্যুরাণী নেমে দাঁড়াতেই একজন অনুচর এসে কুর্নিশ জানিয়ে বললো–সমুদ্রে পথে দুজন বিদেশী এসেছে। তারা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।

দস্যুরাণী অবাক হয়ে বললো–আমার সঙ্গে?

হাঁ রাণীজী।

তাদের এমন সাহস হলো কি করে?

আমরাও আশ্চর্য হয়েছি রাণীজী। একজন সন্ন্যাসী এবং অপরজন এক তরুণ।

বেশ আমার ভূগর্ভ দরবার কক্ষে তাদের নিয়ে এসো কিন্তু সাবধান তাদের চোখ দুটোকে ভালভাবে বেধে তারপর নিয়ে আসবে। যাও...... দস্যুরাণী কথাটা বলে

চলে গেলো তার গন্তব্য পথে।

সোজা সে দরবার কক্ষের দিকে পা বাড়ালো।

এমন সময় পথ আগলে দাঁড়ালো চন্দনা একমুখ হেসে বললো শুনলাম দুজন অতিথি সাগর অতিক্রম করে তোমার নতুন আস্তানায় এসে হাজির হয়েছে তারা কারা?

তা আমি কেমন করে বলবো। বললো দস্যুরাণী।

বললো চন্দনা শুনলাম একজন সন্ন্যাসী অপরজন এক যুবক?

হাঁ আমিও তাই শুনলাম।

একটু হেসে বললো চন্দনা মিঃ আহাদ চৌধুরী ছদ্মবেশে আগম ঘটেনি তো রাণীজী?

অসম্ভব নয় তবে মিঃ আহাদ চৌধুরী এখন দূরদেশে রয়েছেন বিশেষ জরুরি কাজে। কাজেই যত দূর সম্ভব তার আগমন এতো সহজ মনে করছি না। আয় আমার সঙ্গে চন্দনা সব কিছু স্বচক্ষে দর্শন করবি!

বেশ, রাণীজীর দয়ার সীমা নেই। আচ্ছা রাণী তুমি জম্বু পবর্ত ছেড়ে চলে এলে এখানে অজানা এক দ্বীপে আত্মগোপন উদ্দেশ্যে, কিন্তু......।

হেসে উঠলো দস্যুরাণী কোন কিন্তু নেই চন্দনা। যারা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তারা আর কোনদিন ফিরে যেতে পারবে না কারণ তারা কোন সাহসে আমার এখানে এসেছে।

রাণী এবং চন্দনা নতুন আস্তানার অদ্ভুত দরবার কক্ষে প্রবেশ করে স্থিত হয়ে দাঁড়ালো।

চন্দনার চোখে মুখে বিস্ময় ভাব ফুটে উঠেছে।

না জানি কে এরা যাদের দুঃসাহসের সীমা নাই। দস্যুরাণীর আস্তানা শুধু হিমাদ্রী দ্বীপেই নয়, বহু স্থানে রয়েছে। রায়হান বন্দরের নিকটে কোনো এক গহন

বনে দস্যুরাণীর প্রধান আস্তানা। এ ছাড়াও তার বিভিন্ন স্থানে রয়েছে নানা ধরনের আস্তানা। ভ্রাম্যমাণ আস্তানাও আছে রাণীজীর।

চন্দনা আর দস্যুরাণী দরবারকক্ষে পৌঁছানোর একটু পরই দুজন অনুচর এক সন্ন্যাসী ও এক যুবককে নিয়ে প্রবেশ করে দরবার কক্ষে।

কুর্ণিশ জানিয়ে বলে অনুচরদ্বয়ের একজন–রাণীজী, এই লোক দুজন আপনার সাক্ষাৎ কামনা করে এখানে এসেছে।

খুব খুশির খবর! তা সন্ন্যাসী বাবাজী, কি করে আমার সন্ধান পেলেন জানতে পারি কি? দস্যুরাণী বললো।

বললো সন্ন্যাসী–আমি গণনাশাস্ত্রে দক্ষ রাণীজী, কাজেই সব আমার নখদর্পণে।

তা কি প্রয়োজন আমার কাছে? বলল দস্যুরাণী।

আমার ইচ্ছা এ দ্বীপে যখন এসেছি তখন আপনার সাক্ষাৎ লাভ করা....

অতি উত্তম কিন্তু সন্ন্যাসী বাবাজীর জানা নেই হয়তো যে এখানে এলে আর ফিরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

বললো সন্ন্যাসী–চিরদিন থাকতে পারলে নিজকে ধন্য মনে করবো রাণীজী।

দস্যুরাণী তাকালো চন্দনার মুখের দিকে।

তারপর হঠাৎ হেসে উঠলো সে অদ্ভুতভাবে।

জ্যোতিষী সন্ন্যাসীর দুচোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

কম আশ্চর্য হয় না ইন্দ্রনাথ।

দস্যুরাণী হেসেই চলে।

তারপর হাসি থামিয়ে বলে দস্যুরাণী–যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনারা এসেছেন তা সফল হবার নয়। চন্দনা, রহমতকে সংবাদ পাঠাও এদের দুজনকে রায়হান

আস্তানায় নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখুক।

জ্যোতিষী বললো–অতিথির অসম্মান হবে এটা আমরা ভাবতে পারিনি।

অতিথির অসম্মান করা আমার ইচ্ছা নয়। তবে কোনো অতিথির উদ্দেশ্য যদি ভাল না হয় তাহলে....যাক এর বেশি আর জানার দরকার নেই। যখন অনুধাবন করবেন তখন বুঝতে পারবেন সবকিছু।

করতালি দেয় রাণী।

সঙ্গে সঙ্গে আরও দুজন অনুচর এসে হাজির হলো। চারজন মিলে জ্যোতিষী আর ইন্দ্রনাথকে নিয়ে গেলো হাতমোড়া করে। কোনো কথাই দস্যুরাণী শুনলো না তাদের মুখে।

ওদের দুজনকে নিয়ে অনুচরগণ প্রস্থান করতেই চন্দনা বললো–রাণী, ব্যাপার কি বলো তো? অতিথি দুজন এলো তোমার সঙ্গে দেখা করতে অথচ তুমি তাদের একটি কথাও শুনলে না....

কারণ তারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে তা আমি জানি!

তারা কি উদ্দেশ্যে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে বলবে কি রাণী?

নিশ্চয়ই!

দেখো রাণী আমি মনে করেছিলাম সশরীরে মিঃ আহাদ চৌধুরী এসে হাজির হয়েছে তোমার দরবারে কিন্তু...

কিন্তু তোর আশা বা ধারণা মিথ্যা।

হাঁ রাণী, বিমুখ হলাম....

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস কিনা জানি না! বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে তরুণটি এক বিস্ময়।

তার মানে?

মানে তরুণটির সঙ্গে একজনের চেহারার হুবহু মিল লক্ষ্য করেছি।

তরুণটি কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর সুপুরুষ।

কার চেহারার সঙ্গে তার মিল আছে বলতে পারিস চন্দনা?

নিশ্চয়ই পারি?

বল!

কোনো দেবপুরুষের সঙ্গে…

দস্যুরাণী ওর পিঠে মৃদু চপেটাঘাত করে বললো–খুব তত বাহাদুরি করতে পারিস? আসলে একটু যদি তোর স্মরণশক্তি থাকতো।

দাঁড়াও চিন্তা করে দেখি।

সময় নেই।

একটু দাঁড়াও না রাণী।

সারাটা দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলেও তুই বুঝতে পারবিনে আমি জানি।

সত্যি রাণী, তুমি কি আমায় এত বোকা মনে করো? তরুণটি ঠিক আহাদ চৌধুরীর মত দেখতে….

রাণী এবার ওর চুল ধরে ভীষণ জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলো–অন্য কেউ হলে তাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিতাম।

আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছো তো?

না।

কেন?

কোথায় কি বলতে হয় না ভেবে বলিস কেন?

তুমিই বল রাণী!

যাক, বলে আর কাজ নেই। একটা কথা, সন্ন্যাসী ও তার শিষ্যকে আটক করেছি। তারা নিশ্চয়ই এমন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে হাজির হয়েছে যা আমার জন্য চরম এক বিপদ বলা যায়। আমি রায়হান আস্তানায় বসে জানতে পেরেছিলাম জম্বুর পর্বতের অদূরে গহন জঙ্গলে এক সন্ন্যাসী জ্যোতিষী বাস করে।

তারপর? বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো চন্দনা দস্যুরাণীর মুখের দিকে।

রাণী বলে চলেছে–জ্যোতিষী গণনাশাস্ত্রে নাকি খুব অভিজ্ঞ। সে জানতে পেরেছে আমার মহামূল্য সম্পদ মাণিকটির কথা…

সত্যি?

হাঁ চন্দনা। জানতে পেরে সে একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

তারপর?

তারপর সে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে চলেছে কেমন করে এই মহামূল্যবান সম্পদটি হস্তগত করবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিদিন সে জম্বুর পর্বতে সন্ধান চালিয়ে চলেছিলো। কিন্তু সে জানতে পারে জম্বুর পর্বত হতে সে সম্পদ চলে এসেছে লিপাইন দ্বীপে। যদিও এ দ্বীপ সম্বন্ধে এখনও কোনো লোক কিছু জানে না।

আশ্চর্য বটে! বললো চন্দনা।

হাঁ, আশ্চর্যই বটে। সন্ন্যাসী সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে এই মাণিকটির সন্ধান করে ফিরছে। কোন এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সে জানতে পেরেছিলো এই মাণিকটির কথা। পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান মাণিক হলো এই মাণিকটি, যা আমার হস্তগত হয়েছে…. একটু থেমে বললো দস্যুরাণী–জ্যোতিষী মনে করেছে আমি নেহাৎ বোকা–নারী বলে সে আমাকে এরূপ মনে করে এবং সে কারণেই জ্যোতিষী এতদূর এই লিপাইন দ্বীপ পর্যন্ত আসতে সাহসী হয়েছে। শোন চন্দনা, আমি যা সন্দেহ করেছিলাম ঠিক তাই। জ্যোতিষী ঠিক ঐ ব্যক্তি কিন্তু তার সঙ্গীটি কে?

চন্দনা বললো–তরুণটির চেহারা...

বল্ আহাদ চৌধুরীর মত?

না। তাহলে তো আমার গর্দান যাবে!

তবে বল কার মত?

তোমার নতুন বন্ধু....

আমার নতুন বন্ধু? কে আমার নতুন বন্ধু?

বলবো?

স্বয়ং দস্যু বনহুর!

খিল খিল করে হেসে উঠলো দস্যুরাণী তারপর হাসি থামিয়ে বললো–তবে যে এতক্ষণ নেকামি করছিলি? সত্যি চন্দনা, তরুণটিকে দেখে আমার বেশ আশ্চর্য লাগছে, ওর চেহারার সঙ্গে হুবহু মিল আছে দস্যু সম্রাট বনহুরের।

হা রাণী, এ কথা আমারও মনে হয়েছিলো কিন্তু...

বলতে সাহস হয়নি, তাই না?

ঠিক সাহস নয়, স্মরণ হয়নি। তারপর....

যাক তারপর আর শুনে লাভ নেই। চেহারার মিল অমন অনেক সময় দেখা যায়। চন্দনা, তুই আজকেই রহমতকে জানিয়ে দিবি ওরা মানে সন্ন্যাসী জ্যোতিষী একজন সঙ্গী নিয়ে জম্বুর পর্বত ছেড়ে লিপাইন দ্বীপে হাজির হয়েছে। সে এখন আমার বন্দীশালায় বন্দী। রহমত এসে যেন ওকে রায়হান আস্তানায় নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখে।

সত্যি বড় আশ্চর্য!

শুধু আশ্চর্য নয় একেবারে অবিশ্বাস্য। আমি আগে থেকেই সব জানতাম বলেই রক্ষা, নইলে ওরা সুযোগ পেলেই নানা রকম কৌশল চালাতো।

যাক ওসব কথা, তুই চলে যা, শীঘ্র রায়হান আস্তানায় সংবাদটা ওয়্যারলেসে জানিয়ে দে। রহমান এলে সব ব্যবস্থা হবে।

কথাটা বলে দরবারকক্ষ ত্যাগ করে দস্যুরাণী।

চন্দনা চলে যায় নিজের কাজে।

*

বনহুর সবেমাত্র দরবারকক্ষ হতে ফিরে বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো, এমন সময় একজন অনুচর এসে বললো–সর্দার, হিন্দ শহর থেকে আমাদের সন্ধানীদল ফিরে এসেছে কিন্তু জাভেদের কোনো সন্ধান পায়নি তারা।

বনহুর কোনো জবাব দিলো না, তার ললাটে ফুটে উঠলো একটা গভীর চিন্তারেখা।

পেছনে কখন নূরী এসে দাঁড়িয়েছে জানে না বনহুর।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করে একটি আসনে বসলো।

নূরী চেপে ধরলো বনহুরের জামার কলার, ঝাঁকুনি দিয়ে বললো–বলল আমার জাভেদ কোথায়? তাকে আর কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না,..

বনহুর বললো–জাভেদ কচিখোকা নয় যে হারিয়ে গেছে, রাগ বা অভিমান করে গেছে সে। যখন সে তার ভুল বুঝতে পারবে তখন নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।

না, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। আমার সোনামনি নয়নের ধনকে তুমি এনে দাও হুর। তুমি এনে দাও....

নূরী, আমি তো চেষ্টার কোনো ত্রুটি করছি না, সমস্ত কান্দাই তন্নতন্ন করে তার সন্ধান চালিয়ে বিফল হয়েছি। তারপর অন্যান্য দেশেও আমার অনুচরগণ ছড়িয়ে আছে, তারা এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে খোঁজ না করেছে। কিন্তু কোথায় গেলো?

এইতো একটু পূর্বে বললে–সে কচিখখাকা নয় যে হারিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। অথচ তুমিই বলছো কোথায় গেলল। ওগো, তুমি আমার জাভেদকে এনে

দাও।

নূরী, তোমার ছেলের জন্য রহমান আহার–নিদ্রা ত্যাগ করে দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার সন্ধানে।

অনুচরটি বললো–সর্দার, দান্দান, ফ্যালিনা, ঝম শহর, কান্দাই, মন্থনা দ্বীপ সব জায়গা থেকে আমাদের অনুচরগণ ফিরে এসেছে কোথাও জাভেদকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আমার জাভেদ তাহলে বেঁচে নেই। আমার জাভেদকে আর কোনোদিন ফিরে পাবো না? বলো, বলো হুর?

জানি না নূরী, আমি জানি না।

ওগো তাহলে আমি বাঁচবো না...... বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে আকুলভাবে কেঁদে উঠলো নূরী।

বনহুর তাকে কোনো রূপ সান্তনা দিতে পারলো না। তার বুকটাও যে ব্যথায় টন টন করছিলো। জাভেদ তারই সন্তান, শিশু বেলা থেকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিলো বনহুর নিজেও। রক্তের টান সে যে বড় টান। বনহুর জাভেদের প্রতি যত কঠিনই হোক না কেন, একেবারে নির্দয় হতে পারে না। একটা অব্যক্ত বেদনা বনহুর সব সময় অনুভব করছিলো। সে নিজেও রাতের অন্ধকারে নানা বেশে শহরে বন্দরে বিভিন্ন স্থানে সন্ধান করে ফিরেছে জাভেদের। বিফল হয়ে ফিরে এসেছে সব জায়গা থেকে।

আজ নূরীর চোখের অশ্রু বনহুরকে বিচলিত করে ফেলে।

অনুচরটি ততক্ষণে বেরিয়ে গিয়েছিলো।

বনহুর নূরীকে গভীর আবেগে টেনে নেয় কাছে। ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে কিছু সান্ত্বনা দিতে চায় কিন্তু কন্ঠ যেন তার রোধ হয়ে আসে।

নূরী বনহুরের বেদনাক্লিষ্ট হৃদয়ের করুণ কান্না শুনতে পেলো তার বুকে মুখ রেখে। সে বুঝতে পারে সত্যি বনহুর জাভেদের জন্য ব্যথিত।

*

আরও কয়েক দিন কেটে গেলো তবু জাভেদের সন্ধান নিয়ে কেউ ফিরে এলো না।

নূরীর চোখের পানি বাধাহীন স্রোতের মত বয়ে চলেছে। একমাত্র সন্তান নূরীর–সে যে তার কত আদরের ধন তা জানে না এমন জন নেই।

সমস্ত আস্তানায় একটা শোকের ছায়া নেমে এলো।

সেদিন বনহুর আর নূরী বসে আছে একটি বড় পাথরখণ্ডের পাশে। জাভেদকে নিয়েই আলোচনা চলছিলো দুজনের মধ্যে।

এমন সময় কায়েস এসে কুর্ণিশ জানালো।

বনহুর বললো–কি সংবাদ কায়েস?

কায়েস বললো–সর্দার, কান্দাই সরকারের কোনো এক বৈঠকে এমন একটি অন্যায় ব্যাপার পাস করা হয়েছে যা কান্দাইবাসীর জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলবে।

বনহুর একটু হেসে বললো–কান্দাইবাসীর জীবন দুর্বিসহ হতে বাকিই বা আছে কোথায়? বলল কি সংবাদ?

সর্দার, সরকারের দোহাই দিয়ে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা করে নিচ্ছে।

সব আমি জানি। বললো বনহুর।

কায়েস বললো–সর্দার, এর পর আমাদের নীরব থাকা সমীচীন হবে না। দেশের মানুষ অশেষ কষ্ট ভোগ করছে। প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য চরম আকার ধারণ করেছে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এত বেশি বেড়ে গেছে যে, জনগণ দিশেহারা হয়ে পড়েছে তার ওপর আবার দ্রব্যমূল বৃদ্ধি.....সর্দার, দেশে, এত ফসল ফলেও চারিদিকে হাহাকার, শুধুমাত্র দেশের কিছু স্বার্থান্বেষী কর্মকর্তাদের কারসাজি এটা।

কায়েস, এইসব কর্মকর্তার আয়ু আর বেশিদিন নেই। জনগণ সব অনুধাবন করতে শিখেছে যে, তারা এখন আর অজ্ঞ নেই। নিজেদের দেহের রক্ত আর তারা

বিলিয়ে দিতে রাজি নয়। শ্রমিকগণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে কলকারখানায় উৎপাদন বাড়াবে আর সেই উৎপাদিত দ্রব্য স্বার্থান্বেশী কর্মকর্তাগণ তিনতলায় বসে উপভোগ করবে এটা আর তারা হতে দেবে না। কৃষকগণ গোটা বছর জমিতে চাষবাস করে ফসল ফলাবে আর ঐশ্বর্যশালীরা গোগ্রাসে ভক্ষণ করবে এটাও তারা আর সহ্য করবে না। আর সহ্য করবে না তারা এই সব অন্যায় আচরণ।

সর্দার, আমরা কি তাহলে গণ–আদালতের আশায় প্রতীক্ষা করবো?

তোমার বক্তব্য শেষ করে তারপর জানাবো।

কায়েস বলতে লাগলো–জানতে পারলাম কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা যারা দেশের জনগণের বন্ধু বলে দাবি করেন, তারা একটি লিস্ট মানে বাজেট তৈরি করেছেন যে বাজেট দেশের সর্বনাশ টেনে আনবে।

সর্বনাশ টেনে আনবে না–এনেছে বলল। সে বাজেট সরকার পাশ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে দেশের অসৎ ব্যবসায়িগণ উল্লাসিত মনে প্রতিটি দ্রব্যমূল্য সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে রাতারাতি তাদের ঐশ্বর্যভাণ্ডার পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সর্দার এর কি কোনো উপায় নেই?

উপায় আছে এবং তা শুধু পারেন দেশের সরকার।

কি উপায় সর্দার?

এই সব অসৎ ব্যক্তির প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ..... একটু থেমে বললো বনহুর–কিন্তু কঠোর হতে পারেন না সরকার।

কারণ?

কারণ সরকারের লোকরাই যে অসৎ–শুধু অসৎ নয়.....হীন, জঘন্য।

তাহলে সরকার এদের প্রশ্রয় দেন কেন?

নিরুপায় হয়ে।

সর্দার, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না?

তা বুঝবে না। সরকার যদি এই সব কর্মকর্তার প্রতি চরম কঠোর ব্যবস্থা নেয় তাহলে সরকারের গদি হারানোর ভয় আছে। কারণ এরাই তো সরকারের দক্ষিণ হাত এবং বাম হাত। যদিও সরকারের উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু এই সব অসৎ চরিত্রের লোকজনকে নিজের দলভুক্ত করার দরুণ আজ শুধু জনগণই নয়, সমস্ত দেশ অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া দরকার।

সরকার যেখানে উদাসীন সেখানে আমরা কতখানি কি করতে পারি কায়েস? তবে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে আমরা শায়েস্তা করতে পারি যেমন ইতিপূর্বে কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তিদের স্বর্ণাসন থেকে স্বর্ণগুহায় নিক্ষেপ করেছিলাম স্বর্ণ ভক্ষণ করার জন্য। হাঃ হাঃ হাঃ কত স্বর্ণ কত ধন রত্ন তারা উদরে পুরতে পারে আমি তাই দেখতে চাই...কায়েস, আমার কাছে একটি লিস্ট আছে। সেই তালিকায় যাদের নাম আছে তারা কেউ রেহাই পাবে না। তুমি যাও প্রস্তুত হয়ে নাও, আমি আসছি আলোচনা আছে।

কায়েস কুর্ণিশ জানিয়ে চলে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অশ্বপদশব্দ মিশে যায় গহন বনের অন্তরালে।

নূরী চোখ তুলে তাকায় স্বামীর মুখের দিকে।

সে মুখে নূরী ভাবের কোনো পরিবর্তন দেখতে পায় না। শান্ত গম্ভীর পৌরুষদীপ্ত একটি মুখ।

বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে একটি সিগারেট বের করে অগ্নিসংযোগ করে।

নূরী বলে উঠে–জানি তোমার চিন্তায় শেষ নেই। তবু আমি বলবো আমার জাভেদকে তুমি খুঁজে আনন, তারপর তুমি যা খুশি তাই করো।

নূরী, ধৈর্যচ্যুত হচ্ছে কেন? সব সময় আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখো, তিনিই তোমার সন্তানকে রক্ষা করবেন। জানো নূরী, আমার মা সব সময় আমার জন্য

আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করেন, এ কারণে আমি সব বিপদকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারি।

নূরীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো।

স্বামীর পাশে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো সে।

বনহুর আরও কাছে টেনে নিলো ওকে।

আকাশে তারার মালা ফুটে উঠলো। হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করে। আশেপাশে হিংস্র জীবজন্তুর পদশব্দ শোনা যায়।

নূরী ওড়নার আঁচলে চোখ মুছে বলে–রাত হয়ে এলো, চলো হুর।

বনহুর উঠে দাঁড়িয়ে বললো–চলো।

বনহুর আর নূরী ফিরে চললো আস্তানা অভিমুখে। ঘন জঙ্গলে তারার মালা স্পষ্ট দেখা যায় তবু দুএকটা তারা নজরে আসে ছড়ানো মুক্তার মত।

সবেমাত্র পৃথিবীর বুকে অন্ধকার নেমে এসেছে।

হিংস্র জন্তুর আনাগোনা পদচারণায় শুকনা পাতার মড় মড় শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। নূরী স্বামীর দক্ষিণ হাত শক্ত করে চেপে ধরে পথ চলছে। ও পাশে থাকলে একটু ভয় পায় না নূরী, হিংস্র জীবজন্তুকেও না।

অল্পক্ষণে নূরী আর বনহুর আস্তানায় পৌঁছে গেলো।

এবার সোজা বিশ্রামকক্ষে।

নূরীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো বনহুর। সেই পূর্বে যেমন করে সে শুতে।

নূরী ওর ঘন চুলের ফাঁকে আংগুল চালিয়ে চলেছে। বললো নূরী–জানো হুর, জাভেদ চলে যাবার পর থেকে ফুল্লরার মুখের হাসি উবে গেছে। সত্যি ওর ব্যথা আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করছি। ফুল্লরার ফুলের মত চেহারা নিষ্প্রভ মলিন হয়ে গেছে....

ঐ মুহূর্তে দূর থেকে ভেসে আসে করুণ গানের সুর।

বনহুর বলে উঠলো–নূরী, এ কার গলা? কে কাঁদছে?

নূরীর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়লো অশ্রুবিন্দু। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে নূরী বললো–ফুল্লরা কাঁদছে। তুমি কি গলা শুনে চিনতে পারছোনা? ওগো ওর কান্না যে আমি সইতে পারি না।

বনহুরের মুখমণ্ডল ব্যথাকাতর হয়ে উঠলো। সত্যি জাভেদের জন্য তার কম বেদনা নেই। না জানি কোথায় সে, ... কেমন অবস্থায় আছে.... চোখ দুটো ছল ছল হয়ে উঠলো।

নূরী স্বামীর অন্তরের ব্যথা হৃদয় দিয়ে অনুভব করলো।

বনহুরের চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়া পানি মুছে দিয়ে বললো নূরী–সত্যি হুর, তুমিও জাভেদের জন্য কাঁদছে। আমার জাভেদ...

কেন, সেকি আমার সন্তান নয়? নূরী, বুঝবে না আমি তাকে কতখানি ভালবাসি.... বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে বনহুরের কন্ঠস্বর।

নূরী আঁচলে মুছে দেয় ওর চোখের পানি।

ফুল্লরার করুণ কান্না ভরা গানের সুর তখনও ভেসে আসছে দূর থেকে।

বনহুর এবার শয্যা ত্যাগ করে গুহার জানালায় এসে দাঁড়ালো। এখানে থেকে জঙ্গল পথ স্পষ্ট দেখা যায়।

বনহুর কান্দাই জঙ্গলে আস্তানা তৈরির সময় কৌশলে নিজ গুহার একটি জানালাপথ তৈরি করেছিলো যেন সেখান থেকে জঙ্গলের সব কিছু দেখতে পারে। সেই জানালায় দাঁড়িয়ে বনহুর তাকালো সীমাহীন আকাশের দিকে। এ জানালা হতে জঙ্গল ভেদ করে আকাশ দেখা যেতো।

নূরী এসে দাঁড়ালো পাশে।

করুণ গানের সুর ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিলো।

বললো বনহুর ফুল্লরা কি জঙ্গলে বেরিয়ে গেছে?

হাঁ।

রাতের অন্ধকারে তার জঙ্গলে যাওয়াটা কি ঠিক হয়েছে নূরী?

তুমি জানো না হুর, ফুল্লরা এখন সম্বিৎহারার মত। তাকে বারণ করলে সে শুনবে না কিছু।

কিন্তু জঙ্গলে হিংস্র জীবজন্তুর উপদ্রব আছে বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে।

ফুল্লরার যে ব্যথা তা তুমি বুঝবে না। আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছি এ ব্যথা কত কষ্টদায়ক।

বনহুর হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো।

নূরী অবাক হয়ে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

বললো নুরী–হাসছো যে বড়

সত্যি তোমরা মেয়েরা কত অবুঝ।

তার মানে?

মানে বুঝলে না?

না, তোমার হেঁয়ালিভরা কথা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। তুমি বললে মেয়েরা নাকি অবুঝ।

যা সত্যি তাই বললাম, কারণ তুমি নিজেই জানো প্রেম ভালবাসা স্নেহ মায়া মমতা জোর করে আদায় করা যায় না।

কেন আমি কি জয়ী হইনি?

হয়েছ কিন্তু…

বলো কিন্তু কি?

কিছু না নূরী, চলো ঘুমাবে চলো।

না, তোমাকে বলতেই হবে। নরী দুহাতে বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরলো।

নতুন করে আজ পুরানো কথার উত্থাপন হওয়ায় বনহুর কিছুটা ভড়কে গেলো, তার ইচ্ছা ছিলো না তবু হঠাৎ কথাটা বেরিয়ে এসেছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে। বললো বনহুর–নূরী, জাভেদ বড্ড খামখেয়ালী তাই ফুল্লরার প্রতি তার.....

বনহুরকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠলো নূরী–তোমার রক্ত ওর দেহে আছে, কাজেই সে তোমার মত হবেই। তবে ফুল্লরা যা করেছে তা মোটেই অন্যায় নয়, কারণ ফুল্লরা ওকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে....

তুমি যেমন আমাকে বাসতে, এই তো?

হাঁ, আর তোমার ভালবাসা তোমাকে পরাজিত করেছিলো, বলো সত্যি না মিথ্যা?

হেসে বললো বনহুর–যা মনে করো তাই।

আমি তোমাকে যেমন জয় করেছিলাম তেমনি ফুল্লরা জাভেদকে জয় করবে। পবিত্র প্রেম কোনোদিন বিফলে যায় না।

নূরী! বনহুর গভীর আবেগে নূরীকে টেনে নেয় কাছে, বলে–তোমার প্রেম পবিত্রময়, তাইতো তুমি বিজয়িনী।

নূরী গভীর আবেশে স্বামীর বুকে মাথা রাখে।

বনহুর জানালার পর্দা টেনে দেয়।

*

স্যার আমি বড় অসহায়, চাকরিটা আমার নিতান্ত দরকার। করুণ কণ্ঠে বললো যুবকটি।

বড় সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন–চাকরি কি ছেলের হাতের মোয়া যে চাইলেই পাওয়া যায়?

যুবকটি বললো–স্যার, আমি ভালভাবে পরীক্ষা দিয়েছি অথচ....

শুধু পরীক্ষা ভাল দিলেই হবে না তার সঙ্গে চাই মসলা।

মসলা! স্যার, ঠিক বুঝলাম না?

পাঁচ হাজার টাকা চাই.....

স্যার আপনি.....

হাঁ, আমি বলছি পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে, তাহলেই চাকরি পাবে।

এত টাকা আমি কোথায় পাবো স্যার?

তা আমি কেমন করে বলবো?

স্যার!

কোনো কথা শুনবো না–চলে যাও, চাকরি হবে না।

যুবক নিরাশ মনে বেরিয়ে এলো বড় সাহেবের রুম থেকে। ললাটে গভীর চিন্তার ছাপ, মুখমণ্ডল বিষণ্ন মলিন। পথে নেমে দাঁড়ালো যুবক!

কোথায় যাবে সে, চারদিকে শূন্যতা।

আনমনে পথ চলতে লাগলো যুবক।

কিছুদূর চলার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। যুবকটি দেখলো সামনে অনেক লোকের ভীড়, লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে অগণিত লোক।

ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলো সে, একজনকে জিজ্ঞাসা করলো–কি ব্যাপার ভাই?

বললো লোকটা–চাকরি দেওয়া হবে, তাই নাম লেখা হচ্ছে।

খুশিতে দীপ্ত হলো যুবকের মুখমণ্ডল।

বললো–আমি কি দাঁড়াতে পারি?

পারো কিন্তু লাইনের শেষে।

যুবক বললো–আমার বড় দরকার চাকরির কাজেই তোমার কথায় রাজি।

যাও তবে পেছনে গিয়ে দাঁড়াও।

যুবক মাথা নিচু করে লাইনে সবার পেছনে এসে দাঁড়ালো।

শুরু হলো নাম লেখার পালা।

কিন্তু তার বেলায় এসে দরজা হয়ে গেলো বন্ধ। এগিয়ে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলো যুবকটি–ভাই, দরজা বন্ধ হলো কেন?

আজ আর হবে না।

কেন ভাই?

সময় নেই।

যুবক লক্ষ্য করলো পেছন দরজা দিয়ে কিছু কিছু লোক ভিতরে প্রবেশ করছে। যুবকটি এগিয়ে গেলো পেছন দরজার দিকে।

একজন দারোয়ান বাধা দিয়ে বললো–এই ভাগো–ভাগো, এ ধারে কোথায় যাচ্ছো?

বললো যুবক–শুনলাম ভেতরে নাম লেখা হচ্ছে।

মুখ ভেংচে বললো দারোয়ান–টাকা এনেছো? টাকা?

টাকা!

হাঁ টাকা।

কি জন্য?

টাকা না দিলে নাম লেখা হয় না।

কত টাকা লাগবে ভাই?

এক হাজার।

চোখ ছানাবড়া করে বলে যুবক–এক হাজার!

কি, অমন হা করে গেলে কেন?

কোথায় পাব এক হাজার টাকা!

তা আমি বলবো কেমন করে? এক হাজার টাকা কাল নিয়ে এসো, নাম লেখা হবে।

দারোয়ান চলে যাচ্ছিলো, যুবক পথ আগলে দাঁড়ায়, বলে–এক হাজার টাকা দিলে আমার চাকরি হবে?

চাকরি এত সস্তা জিনিস নয় যে এক হাজার টাকা দিলেই পাওয়া যাবে। শুধু নাম লেখার জন্য এক হাজার, তারপর যদি চাকরি চাও তবে আরও চার হাজার, বুঝলে?

ঢাক গিলে বললো যুবক–সর্বনাশ, এত টাকা.....

তাহলে সরে পড়ো। জেনে রাখো যেখানেই যাবে পয়সা খরচ করতে হবে। মোটা পয়সা নাহলে কোনো কাজই হবে না।

ভাই, যার পয়সা নেই তার কি হবে?

তার জন্য আছে ঐ রাজপথ, হাত পেতে বসে পড়ো–দুএক জনের দয়া হলে দুএক পয়সা ছুঁড়ে দেবে তোমার দিকে। নইলে আত্মহত্যা, বুঝলে?

হাঁ বুঝেছি। যুবক একবার সাইনবোর্ডটা ভাল করে দেখে নিলো। তারপর ধীরে ধীরে পথ চলতে লাগলো।

এবার তরুণ এসে দাঁড়ালো একটা হোটেলের সামনে। ক্ষুধায় পেট তার চো চো করছে, নাড়ীভুড়ি হজম হওয়ার যোগাড়। পকেটে পয়সা মোটে দুটো টাকা। যুবক এসে বসলো হোটেলের দরজায় বেঞ্চটার ওপরে।

হঠাৎ কানে এলো হোটেলের ভিতরে ভীষণ হট্টগোল।

যুবক ভিতরে প্রবেশ করলো।

দেখতে পেলো একটা লোককে কয়েকজন তোক বেদম প্রহার করছে।

যুবক থ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, মনে নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। লোকটা কি চোর–বদমাইশ? না, তার চেহারা তো তেমন নয়, বেশ ভদ্র বলে মনে হচ্ছে। লোকটা কি অপরাধ করেছিলো যে তাকে এমনভাবে মারধোর করছে ওরা?

যুবক জিজ্ঞাসা করলো একজনকে–ব্যাপার কি ভাই?

লোকটা বললো–পকেটে পয়সা নেই এসেছে হোটেলে খেতে। খেয়ে নিয়ে আর পয়সা দিতে পারছে না, তাই ওর পিঠে পাওনা শোধ করে নিচ্ছে।

যুবক তার কথাগুলো শুনছিলো কিন্তু দৃষ্টি ছিলো ওদিকে লোকগুলোর উপর। যারা মারছে তাদের দেহ বলিষ্ঠ সবল, চোখে–মুখে বদমায়েশী ছাপ বিদ্যমান। প্রত্যেকের গলায় কালো রুমাল বাধা রয়েছে।

একজন জমকালো লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদেরকে উৎসাহিত করছিলো লোকটাকে মারতে।

ঐ লোকটা হোটেলের মালিক হবে হয়তো।

চেহারাটা শয়তানের মত।

যুবক স্থির নয়নে তাকিয়ে দেখছিলো, অসহায় লোকটা মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। তবু মারছে লোকগুলো ওকে।

এবার যুবকটির ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো, সে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলো ওদেরকে যারা অসহায় লোকটাকে প্রহার করছিলো।

কে জানতো একটা সাধারণ যুবকের দেহে এমন শক্তি। সে এক এক প্রচণ্ড ঘুষিতে এক একজন গুণ্ডাকে ধরাশায়ী করে চললো।

এমনকি হোটেলের মালিককেও যুবক ছাড়লো না। সে তার নাকেও একটা প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে জমকালো লোকটার নাক দিয়ে দর দর করে রক্ত ঝরে পড়লো।

মালিক এবার দিশেহারা হয়ে নিজের ক্যাবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর দ্রুতহস্তে টেলিফোন করলো পুলিশ অফিসে।

কিছুমাত্র বিলম্ব হলো না, নিকটস্থ পুলিশ ফাঁড়ি থেকে দুটো পুলিশ ভ্যানে একজন পুলিশ অফিসার এবং বেশ কয়েকজন পুলিশ চলে এলো, হোটেলটাকে ঘিরে ফেললো।

পুলিশ অফিসার এবং দুজন পুলিশ হোটেলের ভিতর প্রবেশ করে যুবকটিকে গ্রেপ্তার করলো। ঐ লোকটা যাকে ওরা মারছিলো সে কিছু বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু তার কোনো কথাই শুনলেন না পুলিশ অফিসার। দুজন পুলিশকে নির্দেশ দিলেন যুবকের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিতে।

হাতে হাতকড়া পরানো হলো।

হোটেলের মালিক দাঁত বের করে হি হি করে হেসে উঠে বললো–এবার বুঝলে, বদমাইশী করার জায়গা পাওনা? পুলিশ আমাদের হাতের পুতুল, বুঝলে?

যুবক তাকালো হোটেলের মালিকের দিকে।

তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো পুলিশ অফিসারটার দিকে। অবাক কণ্ঠে বললো–পুলিশ তোমাদের হাতের পুতুল।

হাঁ, আমরা তাদের খুশি রাখি কাজেই বুঝতে পারছো....

হোটেলের মালিকের কথার মধ্যে পুলিশ অফিসারটা বলে উঠলেন ওর সঙ্গে কথা বলছেন কেন। পুলিশ দুজনকে ইংগিত করলো–নিয়ে চলো বেটাকে....

যুবকটাকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে চললো পুলিশ ফাড়ির দিকে।

গাড়িতে বসে বললো একজন পুলিশ–এই ছোঁকড়া, পকেটে পয়সা আছে

পয়সা?

হাঁ।

কেন?

পয়সা বের করো যদি রেহাই পেতে চাও।

রেহাই পাবো?

হাঁ পাবে; জেলের ভাত আর পেটে পড়বে না, রক্ষা পাবে।

কত পয়সা লাগবে

যত মোটা অংক দেবে তত শীঘ্র রেহাই পাবে।

তোমাদের অফিসার সঙ্গে আছেন তিনি কি আমাকে ছাড়বেন?

পয়সা পেলে তিনি কেন তার বাবাও ছাড়তে বাধ্য, বুঝলে ছোকড়া।

হায় কপাল, কেন গিয়েছিলাম হোটেলে।

এখন আফসোস করে লাভ নেই। পয়সা বের করলে বাঁচবে মানে উদ্ধার পাবে।

হোটেলের মালিক যে বললেন–পুলিশমহল নাকি তাদের হাতের পুতুল? সত্যি আপনারা কি তাদের....

হেসে বললো পুলিশটা–ওরা মোটা অংক দেন তাই আমরাও তাদের কথা শুনি।

ও তাই বলুন!

শুধু ছোটলের মালিক নয়, শহরের বহু জাদরেল লোক আছেন যারা আমাদের মোটা অংক দেন।

জাদরেল লোক! তারা কারা?

শহরে যারা জাঁদরেল ব্যবসায়ী আছেন…

মানে, মানে যারা ব্যবসা করেন?

হাঁ।

কিন্তু তারা আপনাদের…

কেন খুশি করেন এই কথা তো জানতে চাও?

হাঁ।

তারা যখন গোপনে মাল চালান করেন তখন আমাদের মোটা অংক দেন তাতে আমরা পুলিশমহল দেখেও না দেখার ভান করি, কাজেই

কাজেই দেশের সম্পদ অনায়াসে কালোবাজারী হয়ে বাইরে চলে যায়।

বেটা মুখ সামলে কথা বলল।

আমি বড় গরিব, আমাকে জেলে আটকালে আপনাদের কোনো লাভ হবে না, বরং আমাকে আপনারা ছেড়ে দিন।

হেসে উঠলো পুলিশটি, বললো–আমরা হুকুমের দাস। আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই তোমাকে ছেড়ে দেই… আগের গাড়িতে অফিসার সাহেব আছেন তিনি যদি বলেন তবে ছেড়ে দিতে পারি কিন্তু আমাদের উপর নির্দেশ আছে মোটা অংক না পেলে..বুঝতেই পারছে।

যুবক বললো–আমার পকেটে মাত্র দুটাকা আছে।

দুটাকা! অবজ্ঞাভরে বললো অপর পুলিশটা।

যুবক বিষণ্ন মুখে তাকালো পুলিশদ্বয়ের দিকে।

সে দৃষ্টি অসহায়।

পুলিশদের একজন বললো–তবে হ্যাঁ, এক কাজ করতে পারো।

বলুন কি কাজ?

কাজ হলো অফিসার সাহেবকে বলে তোমাকে খালাস করে দিতে পারি তবে এক শর্তে।

বলুন কি শর্ত?

তোমার স্বাস্থ্য দেখে মনে হয় ছ্যাচড়া চোর নও, বা পকেটমার নও তুমি ডাকাতি করতে পারো।

মানে? অবাক হয়ে তাকালো যুবকটা পুলিশটার মুখের দিকে।

পুলিশটা চাপা গলায় বললো–আমরা তোমাকে সুযোগ দেবো, তুমি রাহাজানি করে লভ্যাংশ আমাদের দেবে।

রাহাজানি!

হাঁ, যানবাহনে ডাকাতি…

কিন্তু ধরা পড়লে?

পেটে খেলে পিটে সইতে হয়। তবে তোমাকে উদ্ধার করবো আমরা।

সত্যি!

হা তোমার লাইফ ফিরে যাবে, বুঝলে?

আর যদি ধরা পড়ে গণপিটুনি ভাগ্যে জোটে তখন….তখন আপনারা কেন, কেউই আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না।

বেটা তাহলে জেলে পচে মরবে!

অদৃষ্ট মন্দ সারাটা দিন ঘুরেছি চাকরির আশায় কিন্তু...

থামলে কেন বলো?

কোথাও চাকরি পেলাম না। দীর্ঘদিন ধরে আমি একটা সামান্য চাকরির জন্য ঘুরছি তবু কোথাও পেলাম না। বাড়িতে ছোট ভাই বোন না খেয়ে মরছে। আপনাদের বড় দয়া তাই আমার দুঃখের কথা শুনছেন। কেউ আমার দুঃখের কথা শোনে না।

বেটা, তাহলে অমন করে হোটেলের লোকদের মারপিট করছিলে কেন?

স্যার, অন্যায় আমি সহ্য করতে পারি না তাই।

জানোনা বাছাধন আজকাল সাধুপনা চলে না। ন্যায়নীতি কথা বলে পেট ভরে না। যত অন্যায় করবে তত ধন হবে যেমন আমাদের বড় সাহেব...

বড় সাহেব!

হাঁ মস্তবড় ধনী, কারণ তিনি বাম হাতের রাজা!

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না?

তা তোমার বুঝে কাজ নেই। আমাদের বড় সাহেব খান মিযা বহু ধন দৌলতের মালিক। আজ তার কয়েকটা বড় ইণ্ডাষ্ট্রি, কল–কারখানা। বহু টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স।

সত্যি?

হাঁ সত্যি! ন্যায় পথে থাকলে কি তার আজ এত হতো?

যুবকটা বললো–আপনাদের বড় সাহেব বড় বোকা।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো পুলিশ দুজন।

ভ্যানের চালক হাসির শব্দে ফিরে তাকালো তার সঙ্গী পুলিশদের দিকে।

ততক্ষণে হাসি বন্ধ করে বলে পুলিশটা–বড় সাহেব বোকা না তুমি বোকা। তার যা আছে কান্দাই শহরে অনেক ধন-বানেরও তা নেই।

জানি যার যত বেশি আছে তার তত বিপদ আর যাদের নেই তাদের কোনো বিপদও নেই। কাজেই অসৎ উপায়ে টাকা উপার্জনা করে বড়লোক হওয়া যায় কিন্তু বড় হওয়া যায় না। যাক। ওসব কথা, তোমরা যদি আমাকে ছেড়ে দাও তাহলে তোমরা যা বলেছে সেইভাবে কাজ করবো। রাহাজানি চুরি ডাকাতি…..

শুধু শেয়ার থাকবে আমাদের।

বেশ রাজি! তবে ছেড়ে দাও….

পুলিশ দুজন হেসে উঠলো।

একজন পুলিশ বললো–চিড়ে কলা নয় যে দিলাম তুমি গপ গপ করে খেয়ে নিলে। তোমাকে অফিসে যেতেই হবে। আমরা অফিসার সাহেবকে বলবো তিনি আবার বলবেন আমাদের বড় সাহেবকে। শেয়ার পাবনা আমরা সবাই…

এ্যা, বলেন কি স্যার?

হাঁ যা সত্যি তাই বলছি। বেটা তুমি তো কোনছার বড় বড় জাদরেল কালোবাজারী, বড় বড় চোর–ডাকু এরা শহরে কি করে ব্যবসা চালায়। সবাই আমাদের বলে–কয়েই কাজ করে। আমরাও তাই দেখে না দেখার ভান করি। না হলে আমাদের চোখে ধুলো দেয় কোন বেটা। পুলিশ সুপারটা বড় কড়া, শুধু তাকেই এড়িয়ে কাজ করতে হয়। যদি জানতে পারেন তিনি তাহলে আমাদের চাকরির বারোটা বাজবে।

যুবক হাসলো।

পুলিশ দুজন বললো–হাসলে যে বড়?

হাসবো না? ক্ষুধায় হাসি পাচ্ছে।

তুমি তো বড় অদ্ভুত ছোকরা। ক্ষুধায় তো মানুষ কাঁদে, ক্ষুধায় কি কেউ হাসে?

আমার হাসি পায়।

বেশ, জেলে গেলেই হাসি কোথায় উবে যাবে, তখন দেখবে মজাটা কেমন। এই তো আমরা হেড অফিসে এসে গেছি।

যুবক হাতকড়া পরা হাতখানার দিকে তাকালো। তার চোখেমুখে অসহায় দৃষ্টি।

পুলিশ ভ্যান দুটি ততক্ষণে কান্দাই পুলিশ হেড অফিসে পৌঁছে গেছে।

আগের পুলিশ ভ্যানটি থেকে নেমে পুলিশ অফিসার এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসে পৌঁছে গেছে।

পেছনের ভ্যানের পুলিশ দুজন নেমে পড়লো।

যুবক নিজের মলিন জামাকাপড়ের দিকে তাকালো, তারপর হাতকড়া পরানো হাত দুখানার দিকে একবার দেখে পুলিশ ভ্যান থেকে পুলিশদ্বয়ের সঙ্গে নেমে দাঁড়ালো।

হাতে হাতকড়া পরা যুবক।

পুলিশ হেড অফিসে প্রবেশ করতেই অফিস ইনচার্জ পুলিশ অফিসার হাতকড়া পরা যুবকটিকে লক্ষ্য করে বিস্মিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন–মিঃ নূর আপনি।

যে পুলিশ অফিসার এবং পুলিশ দুজন যুবকটিকে গ্রেপ্তার করে এনেছিলো তারা থ হয়ে গেলো, দুচোখে তাদের রাজ্যের বিস্ময় ফুটে উঠলো। মুখ হা হয়ে গেছে এক একজনের।

ওরা অবাক, যে যুবকটাকে তারা গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলো তিনি প্রখ্যাত ডিটেকটিভ অফিসার মিঃ নূর! যিনি যুবকটার হাতে হাত কড়া পরিয়ে দেবার জন্য পুলিশদিগকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি দ্রুত হস্তে হাতকড়া খুলে দিয়ে হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করলেন এবং বার বার ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে লাগলেন।

হাসলো নূর, বললো–আপনারা ভুল করেননি। যা আপনারা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু.... একটু থেমে বললো নূর–যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তাতে আমি ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছি। এবার আপনারা যেতে পারেন!

গম্ভীর কণ্ঠে বললো নূর।

যে পুলিশ অফিসার এবং পুলিশগণ বেকার যুবটিকে গ্রেপ্তার করে এনেছিলো তারা লজ্জায় মাথা নত করে ধীরে ধীরে প্রস্থান করলো।

পুলিশগণের মুখ কালো হয়ে উঠেছে।

তারা অপকটে অনেক কথা বলে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, তাকে রাহাজানি আর ডাকাতি করতে উৎসাহিত করেছে। ভয়ে হৃদকম্প শুরু হলো পুলিশদের। চাকরির মায়া তাদের উবে গেলো কর্পূরের মত। শুধু চাকরি যাবার ভয় নয়, জেলে পচে মরার ভয়। কারণ পুলিশগণের মনের কথা সব জেনে নিয়েছেন মিঃ নূর, এবার রেহাই নেই কারও।

ওরা বিদায় গ্রহণ করার পর নূর পুলিশ সুপার মিঃ আহমদকে লক্ষ্য করে বললো–এই দুদিন আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম তাতে আমি অনেক লাভবান হয়েছি। এ ব্যাপারে অনেক কথা আছে, কাজও আছে অনেক। এখন আমি বাসায় যাচ্ছি, বিকেলে আসবো। কথাগুলো অত্যন্ত ভারী গলায় বললো নূর।

মিঃ আহমদ উঠে করমর্দন করলেন নূরের সঙ্গে।

নূর ঐ মুহূর্তে আর কোনো কথা বললেন না, সে সোজা বেরিয়ে গেলো পুলিশ অফিস থেকে।

*

বাসায় ফিরে গোসলখানায় প্রবেশ করলো নূর। অনেকক্ষণ ধরে গোসল করে তারপর বেরিয়ে এলো গোসলখানা থেকে।

মাথাটা তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে বেডরুমে প্রবেশ করতেই চমকে উঠলো– হ্যাঁ আম্মু তুমি!

হাঁ এলাম।

হঠাৎ

শুনলাম কদিন ধরে বাসায় ফেরোনি? বললো মনিরা।

নূর হেসে বললো–বাসায় না ফিরলেই তোমার এত দুশ্চিন্তা হয় কেন আম্মু? জানো তো আমার কত কাজ।

জানি, তাই বলে…

আম্মু এখন আমি অনেক বড় হয়েছি। সেই ছোট্ট খোকাটি এখন আর নেই। তুমি কিছু ভেবো না, আমি নিজকে সামলে চলাফেরা করতে পারবো।

ঠিক বাপের মতই কথা বলার ভঙ্গি শিখেছে। শুধু কাজ আর কাজ….. এত কি কাজ বলতো বাপ?

নূর তোয়ালেটা আলনায় ঝুলিয়ে সাদা পাঞ্জাবীটা গায়ে পরতে পরতে এগিয়ে আসে।

মনিরা পাঞ্জাবীটার নিচের অংশ টেনে ঠিক করে দিতে দিতে বলে–কাজ আছে বলেই কি জানটা মাটি করবি? কদিন ধরে টেলিফোন করছি একটি দিনও তোকে পেলাম না। সব সময় কোথায় থাকিস বলতো?

নূর বসলো বিছানার পাশে।

মনিরা একটা চেয়ারে বসে তাকালো পুত্রের মুখের দিকে, ভালভাবে লক্ষ্য করে বললো কদিনে কি চেহারা হয়েছে। শরীরের প্রতি এত অনিয়ম করলে চলে?

নূর ভাবলো ভাগ্যিস বাথরুম থেকে বেরুনোর পর মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে, নইলে মা যদি দেখতেন মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুল উস্কুখুস্ক পরনের জামাকাপড় মলিন তাহলে রক্ষা থাকতো না।

কি ভাবছিস নূর?

কিছু না আম্মু।

না, নিশ্চয় তুই গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিস?

হাঁ মা সত্যি করছি। তোমাকে কতগুলো কথা বলবো যা তুমি অট্টালিকায় বসে কোনোদিন ভাবতে পারো না, কদিন ধরে আমাকে কেন খুঁজে পাওনি এবার তোমাকে বলবো কিন্তু বড় ক্ষুধা....বড়ড় ক্ষুধা আম্মু। আমার পেটের নাড়ীভূড়ি হজম হবার জোগাড়।

চোখেমুখে বিস্ময় টেনে বললো মনিরা–বলিস কি নূর!

হাঁ আম্মু! ক্ষুধার জ্বালায় পেট চো চো করছে। বাবুর্চি....বাবুর্চি...খাবার নিয়ে এসো।

বাবুর্চি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো–স্যার খাবার নিয়ে আসছি।

শীঘ্র নিয়ে এসো। বললো মনিরা।

বাবুর্চি চলে গেলো।

একটু পর সে ফিরে এলো ট্রেতে করে খাবার নিয়ে।

মনিরা ট্রেখানা বাবুর্চির হাত থেকে টেবিলে নামিয়ে নিয়ে খাবারের প্লেট বাড়িয়ে দিলো নুরের দিকে। গোগ্রাসে খেতে শুরু করলো নূর।

মনিরা হাস্যোজ্জ্বল দীপ্ত মুখে বললো–এমন করে পেটে ক্ষুধা নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কোনো মানে হয়?

কেন হবে না আম্মু। আমি অন্তর দিয়ে মানে হাড়ে হাড়ে অনুভব করলাম অসহায় দীন–দুঃখী গরিব যারা তারা ক্ষুধার জ্বালায় কত কষ্ট পায়।

মনিরা বললো–পকেটে পয়সা যাদের না থাকে তাদের অবস্থা সত্যি শোচনীয়।

তাই তো আম্মু, আমি সত্যিকারের জ্বালা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য প্রায় খালি পকেটে বেরিয়েছিলাম। দেখবো পকেটে পয়সা না থাকলে তাদের কেমন অবস্থা হয়।

খেয়ে নে বাবা, তারপর সব শুনবো।

না আম্মু আমাকে খেতে খেতে বলতে দাও। জানো আম্মু দুনিয়াটা দেখলাম কত নির্মম, কত কঠিন। এখানে যারা বাস করে তার ও শতকরা নিরানব্বইজন অসৎ অন্যায়কারী পিশাচ। কথাগুলো বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে নূর, তার চোখে–মুখে ফুটে ওঠে একটা ভীষণ কঠিন ভাব।

মনিরা পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় বনহুরের মুখোচ্ছবি। রাগ হলে তার সুন্দর মুখমণ্ডল কঠিন আকার ধারণ করে, তখন তাকে আরও সুন্দর লাগে।

স্বামীর মুখোচ্ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। মনিরা বলে–বাবা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়েই তো তোর আব্বু আজ মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে।

নূর বললো–দেশটা অন্যায় অনাচার শোষণ নিষ্পেষণ আর কুকর্মে ভরে উঠেছে। কালোবাজারী, ঘুষখোরী, আর অন্যায় কার্যে প্রতিটি মানুষ কলুষিত। লোভ–লালসায় ভুলে গেছে তারা মানুষ। সত্যি আম্মি তোমাকে কি বলবো, যেখানে গেছি সেখানেই দেখেছি অন্যায় অনাচার। এমন কোনো জায়গা দেখলাম না যেখানে মহত্ব বলে কিছু আছে। এমন কি প্রশাসন বিভাগেও...

মনিরা বললো নূর, তুমি ছেলেমানুষ তাই জানো না সবচেয়ে প্রশাসন বিভাগেই দুর্নীতি বেশি.....

এ কথা মিথ্যা নয়, সব জায়গায়ই দুর্নীতি। আব্বু যা করেছেন তা তিনি ঠিকই করেছেন। উচিত শিক্ষা না পেলে মানুষনামী জন্তুগুলো সায়েস্তা হবে না। জানো আম্মি, একটা সামান্য চাকরির জন্য মানুষ কত নাজেহাল হয়, কত নির্মম ব্যবহার পায় তারা মানুষের কাছে। ততক্ষণে নূরের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিলো, ছোট তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে বললো–সব তোমাকে বলছি। কদিনের অভিজ্ঞতায় যা জেনেছি তা বড় নির্মম... বেকার যুবকের বেশে আমি বেরিয়ে পড়লাম। পকেটে মাত্র সামান্য কয়েকটি টাকা নিয়ে.... সমস্ত কাহিনী নূর সুন্দরভাবে সংক্ষেপে মায়ের কাছে বর্ণনা করলো। নূর আদর করে মনিরাকে মাঝে মাঝে আম্মি এবং আম্মু ডাকতো।

মনিরা পুত্রের মুখে আম্মির চেয়ে আম্মু ডাকে বেশি খুশি হতো।

সব শুনে মনিরা হতবাক হলো, কারণ সে যে পরিবেশে মানুষ তাতে এসব তার জানার কথা নয়। বললো মনিরা–কি নির্মম, কত জঘন্য এ দেশের মানুষ নামি নরপশুগুলো।

আম্মি, আমি এদের সবাইকে শায়েস্তা করে ছাড়বো। তুমি দেখে নিও কেমন করে এদের শুধরাতে হয় তা আমি দেখিয়ে দেবো সবাইকে জেলে পচিয়ে মারবো, ক্ষমা করবো না কাউকে।

চাকরি যারা করে?

তাদের চাকরি খোয়া যাবে? দাঁতে দাঁত পিষে বললো নুর।

এমন সময় বাবুর্চী এসে দাঁড়ালো।

মনিরা বললো–এসব নিয়ে যাও।

বাবুর্চি ট্রের ওপরে প্লেট তুলে নিয়ে চলে গেলো।

এমন সময় নিচে গাড়ি থামার শব্দ হলো।

মনিরা বললো–নূর, তোমার কাছে কেউ এসেছে বলে মনে হচ্ছে।

হয়তো তোমার কথা সত্য, তুমি একটু ভিতরে যাও আম্মু।

মনিরা পাশের কামরায় চলে গেলো। ততক্ষণে সিঁড়িতে ভারী জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছিলো।

একটু পরে ভেসে আসে মিঃ উইকোর কণ্ঠস্বর–ভিতরে আসতে পারি?

নূর বললো–কোনো আপত্তি নেই। আসুন।

মিঃ উইকো কক্ষে প্রবেশ করে নূরের দিকে হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করলেন।

একটি চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললো নুর–বসুন মিঃ উইকো। বলুন কি সংবাদ

মিঃ ঊইকো আসন গ্রহণ করে সিগারেট কেসটা বের করে মেলে ধরেন নূরের দিকে।

নূর হাস্যোজ্জ্বল দীপ্ত মুখে বলে–মা আছেন।

মিঃ উইকো নিজেও সিগারেট পানে ক্ষান্ত হন, তিনি সিগারেট কেসটা আলগোছে প্যান্টের পকেটে রেখে বলেন, সংবাদ আপনার কাছে জানতে এলাম। শুনলাম আপনি গ্রেপ্তার হয়ে পুলিশ অফিসে হাজির হলে সবাই বিস্মিত হতবাক হয়ে গিয়েছিলো। কি ব্যাপার বলুন তো?

ব্যাপার নতুন কিছু নয়, দেশের ভাবধারা অনুধাবন করলাম।

মানে?

দেশের যারা গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তারা কত অসৎ, কত অন্যায়কারী হতে পারে তা প্রত্যক্ষ দর্শন করলাম। এই শয়তানদের দেশ থেকে উচ্ছেদ না করলে কোনো দিন দেশ সোনার দেশে পরিণত হতে পারে না।

হাসলেন মিঃ উইকো, যাদের আপনি দেশ থেকে উচ্ছেদ করতে চাইছেন তাদের কি কোনো দিন উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে?

একেবারে সম্ভব হবে না, তবে প্রচেষ্টা চালালে হয়তো অধিকাংশ হতে পারে।

আরও কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা হলো তাদের মধ্যে তারপর এক সময় বিদায় গ্রহণ করলেন মিঃ উইকো।

এবার কচি খোকার মত আদর করে ডাকলো নূর–আম্মু, বেরিয়ে এসো।

আসছি বাবা! বলে মনিরা বেরিয়ে আসে পাশের ঘর থেকে।

চলো আম্মু, তোমাকে এবার রেখে আসি? বলে উঠে দাঁড়াতে গেলে নূর।

মনিরা ব্যস্তকণ্ঠে বললো–কোনো দরকার হবে না। গাড়িতে আমার ড্রাইভার আছে। বরং তুমি ঘুমাও, নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করো। কদিনে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

নূর সত্যি বড় ক্লান্ত, অবসন্ন। বিশ্রাম তার প্রয়োজন। কিন্তু সময় নেই বিশ্রামের, কারণ তাকে এক্ষুণি বেরুতে হবে। কদিনে যা সে জানতে পেরেছে তা তার মনকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছে। যতক্ষণ এইসব দুর্নীতিবাজ লোকদের কঠিনভবে সায়েস্তা করতে না পেরেছে, ততক্ষণ তার শান্তি বা স্বস্তি নেই।

মনিরাকে গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলো নূর। মায়ের কথাগুলো নূরের, কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সত্যি তাকে নিয়ে মায়ের কত ভাবনা। মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে।

নূর চুল আঁচড়ানোর জন্য আয়নার সম্মুখে এসে দাঁড়াতেই চমকে উঠলো ভীষণভাবে। আয়নায় সে যাকে দেখতে পেলো সে পরম আদরের জন। ফিরে হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো আব্বু তুমি!

হাসিভরা মুখে পাশে এসে দাঁড়ালো বনহুর–নূর, মায়ের কথা মেনে চলতে হয়। আমি জানি তুমি তোমার মায়ের আদেশ পালন না করে এক্ষুণি তৈরি হচ্ছো বাইরে বের হতে।

নুর হকচকিয়ে গেলো, তার মনের কথা আব্বু কি করে বুঝলো।

বনহুর বললো–নূর, তোমার বিশ্রাম নিতান্ত প্রয়োজন। কদিন তুমি অত্যন্ত শারীরিক কষ্ট করেছে।

একটু হেসে বললো বনহুর–কদিন আমি সর্বক্ষণ তোমার সঙ্গেই ছিলাম।

তুমি আমার সঙ্গে ছিলে।

হাঁ।

এ তুমি কি বলছ

নূর, তুমি নতুন করে এসব নরশয়তানদের যাচাই করছে জেনে আমি চুপ থাকতে পারিনি। যেখানে তুমি গেছো আমি ছায়ার মত তোমার সঙ্গে ছিলাম। অবশ্য ছদ্মবেশে। তোমাকে সাহায্য করাই আমার উদ্দেশ্য।

আব্বু!

হাঁ নূর। তুমি যাদের আচরণে বিস্মিত হয়েছে তারা এ পৃথিবীর দুষিত কীট। তবে হাঁ মিঃ উইকোর সঙ্গে তোমার যখন আলাপ হচ্ছিলো তখন বুঝতে পারলাম তুমি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছে এবং তাদের কিভাবে সায়েস্তা করা যায় সে বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তা করছে। নূর, এরা সংখ্যায় এত বেশি যে এদের সায়েস্তা করা সহজ হবে না।

তাহলে কি আমাকে নিশ্চুপ দেখে যেতে হবে কিছু করতে পারবো না?

ধৈর্যচ্যুত হচ্ছো কেন নূর।

বলো তাহলে কি করবো?

বলবো বলেই এতক্ষণ প্রতীক্ষা করছিলাম। তোমার বাবুর্চি আপাততঃ রান্নাঘরে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আছে।

তাহলে তুমি.....

হাঁ, আমি বাবুর্চিবেশেই ছিলাম এতক্ষণ।

আব্বু তুমি আমার চোখে ধুলো দিয়েছ!

তুমি এত বেশি উত্তেজিত এবং অন্যমনস্ক ছিলে যে আমার ছদ্মবেশ ধরতে পারোনি.....।

বলো এখন তাহলে করণীয় কি, আমাকে কি করতে হবে?

বনহুর মুক্ত জানালা দিয়ে তাকালো দূরে নীল আকাশে ভেসে বেড়ানো সাদা কালো মেঘের পাহাড়গুলোর দিকে। অস্তমিত সূর্যের আলো সাদা কালো মেঘগুলোর উপরে অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে চলেছে।

বললো বনহুর–এদের সায়েস্তা করার একমাত্র পথ, সরকারকে কঠিন হতে হবে। যখনই দুর্নীতিবাজ ধরা পড়বে তখনই তাকে প্রকাশ্য রাজপথে এনে মাথা নেড়ে করে মুখে চুন কালি মাখিয়ে, গলায় জুতোর মালা পরিয়ে জনগণের সম্মুখে নাক কানে খত দিতে হবে। তারপর তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে, যেন জীবনে সে আর এমন কাজ করার সাহস না পায়। একটু থেমে বললো বনহুর–

শুধু কয়েকজনকে এভাবে শাস্তি প্রদান করলে দেশ থেকে অন্যায় অনেক কমে যাবে। অন্যায়কারীরা সাবধান হবে।

আব্বু তুমি যা বললে, তা অতীব সত্যি, কারণ দেশের নিরানব্বই জন লোক আজ অসৎ পথে অর্থ উপার্জন করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে যাচ্ছে।

কঠিন হাতে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ হতে হবে। যারা দেশের এবং দশের ক্ষতি সাধন করে চলেছে তাদের প্রকাশ্য শাস্তিদেওয়া দরকার তাহলে দেশ থেকে দুর্নীতি দূরীভূত হবার সম্ভাবনা আছে। একটু থেমে বললো–সরকার বিশ্বাস করে তার পারিষদগণকে। শুধু বিশ্বাস নয়, প্রশ্রয় দিয়ে তাদের চরম সীমায় তুলেছে। তারা জানেন যত দূর্নীতিই করুক না কেন তাদের সাত খুন মাফ এবং এ কারণেই আজ দেশের এ চরম অবস্থা।

আব্বু সব বুঝি!

বোঝ, তবে সরকারকে চোখে আংগুল দিয়ে বুঝিয়ে দাও। সরকারের হিতাকাঙ্খী যারা আছে তারা রিপোর্টে জানাও, নির্ভীক চিত্ত নিয়ে জানিয়ে দাও যা করণীয়। প্রকাশ্য বিচার না হলে নরপশুরা সাবধান হবে না এবং দেশের কল্যাণ হবে না।

এমন সময় গাড়ি বারান্দায় গাড়ি থামার শব্দ হয়।

বনহুর উঠে দাঁড়ায়, বলে–পরে আরও কথা আছে এ ব্যাপারে। কথা শেষ করে বেরিয়ে যায় বনহুর।

সিঁড়িতে ভারী জুতোর শব্দ শোনা যায়।

একটু পরে কক্ষে প্রবেশ করেন মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও।

নূর খুশি হলো, মনে মনে সে এই দুই মহারথীর প্রতীক্ষায় ছিলো। এ কদিনে অভিজ্ঞতা বা যে তথ্য সংগ্রহ সে করেছে তা নিয়ে এঁদের সঙ্গে আলোচনা হওয়া দরকার। হঠাৎ যদি ঐ মুহূর্তে বনহুর হাজির না হতো তাহলে নূর বেরিয়ে পড়তো মহারথীদ্বয়ের উদ্দেশ্যে।

নূর উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালো মিঃ শংকর রাও এবং মিঃ হারুনকে।

বললো নূর–স্যার, আপনাদের ওখানেই যাবো ভাবছিলাম। আপনারা এসে গেছেন এ জন্য অনেক ধন্যবাদ।

আসন গ্রহণ করলেন মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও।

নূর নিজেও আসন গ্রহণ করলো।

শুরু হলো তাদের মধ্যে গোপন আলোচনা।

*

রাণীজী, বৃদ্ধ জ্যোতিষী আর তরুণটি হঠাৎ একেবারে এখানে এসে হাজির হয়েছে সত্যি এটা বিস্ময়কর। ওরা কি করে জানলে আপনি এখানে আছেন? কথাগুলো বললো রহমত।

দস্যুরাণী ধীরে ধীরে পায়চারী করছিলো চোখেমুখে তার কঠিন একটা ভাব ফুটে উঠেছে।

রহমতের কথা শেষ হতেই বললো রাণীজী–জ্যোতিষী নাকি গণনাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। সে গণনায় সবকিছু জানতে এবং বুঝতে পারে।

রাণীজী, আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। হয়তো আমাদের কোনো অনুচর তাদেরকে সহায়তা করেছে।

না, আমার অনুচরগণ কখনো এমন কাজ করতে পারে না। রহমত!

বলুন রাণীজী।

জ্যোতিষী আর যুবককে তুমি রায়হান আস্তানায় নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখো। আমি ওদের বিচার সেখানেই করবো।

আপনার আদেশমত কাজ করবো রাণীজী।

বিলম্ব করো না, আজই ওদের নিয়ে ফিরে যাও।

রহমত কুর্ণিশ জানিয়ে প্রস্থান করলো।

যখন রাণী আর রহমত কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন ভূগর্ত বন্দীশালায় জ্যোতিষী আর ইন্দ্রনাথ কৌশলে একটি পাথর সরিয়ে সুড়ঙ্গপথ আবিষ্কার করে ফেলে। এত সহজে এমন একটা সুড়ঙ্গ পথের সন্ধান পাবে ভাবতে পারেনি তারা।

দস্যুরাণীর এ আস্তানা পুরোনো নয়–নতুন। কাজেই ভূগর্ভ হলেও গুহাগুলোর দেয়াল এখনও তেমনভাবে পরীক্ষা করা হয়নি।

বন্দীশালার দেয়ালে যে এমন একটা আলগা পাথর বা সুড়ঙ্গপথ থাকতে পারে তা দস্যুরাণীর অনুচরগণ বুঝতে পারেনি।

জ্যোতিষী আর ইন্দ্রনাথ ঐ পথে বেরিয়ে গেলো।

বন্দীশালার দরজায় বিরাট তালা যেমন লাগানো ছিলো, তেমনই রইলো। প্রহরী একটুও টের পেলো না। ইন্দ্রনাথ পাথরখণ্ডটা পুনরায় ঠিক মত সুড়ঙ্গমুখে লাগিয়ে দিয়ে ওরা দুজন এগিয়ে চললো।

তারপর এক সময় এমন এক জায়গায় এসে হাজির হলো যেখানে আলো বাতাস নেই–একটা। অন্ধকার গুহায়।

জ্যোতিষী বললো–ইন্দ্র আমি জানি তুমিই পারবে সেই সাত–রাজার ধন মাণিক উদ্ধার করতে এবং এই সেই পথ।

ইন্দ্রনাথ বললো–এখানে তো কোনো পথ দেখতে পাচ্ছি না সন্ন্যাসী বাবা।

আছে। নইলে আমার গণনা ভুল হবে।

জ্যোতিষী দুটো পাথর ঠুকে আগুন জ্বালালো। সেই আগুনের ঝলকানিতে তারা দেখলো দক্ষিণ দেয়ালে একটি সিংহমূর্তি। বিরাট সিংহমূর্তিটির মুখগহ্বর।

জ্যোতিষী সেই সিংহ মূর্তির দিকে অগ্রসর হলো।

সিংহমূর্তির চোখ দুটো দপদপ করে যেন জ্বলছে। অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যেন চোখ দুটো।

জ্যোতিষী বললো–ইন্দ্র, তুমি ঐ সিংহমূর্তির গহ্বরে প্রবেশ করো।

ইন্দ্রনাথ জ্যোতিষীর কথা মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগলো।

জ্যোতিষী বললো–সিংহের মুখগহ্বরে প্রবেশ করলে তুমি একটি সুড়ঙ্গপথ পাবে, ঐ পথে কিছুদূর অগ্রসর হলেই দেখবে একটি ছোট্ট গুহা। সেই গুহার দক্ষিণ পাশে একটি পাথর আছে। ঐ পাথরটা সরিয়ে ফেললেই দেখবে একটি মস্তবড় সিন্দুক। তার মধ্যে আছে সেই মহামূল্যবান পাথরটি।

ইন্দ্রনাথ বললো–আচ্ছা।

শোন ইন্দ্রনাথ, যত দ্রুত পারো কাজ উদ্ধার করবে। আমি বৃদ্ধ, তাই শক্তির দিক দিয়ে অক্ষম, এ কারণেই তোমাকে আমি বেছে নিয়েছি এ কাজের জন্য। যাও আর বিলম্ব করো না।

জ্যোতিষীর নির্দেশমত ইন্দ্র সিংহমূর্তির মুখ গহ্বরে প্রবেশ করলো। দুঃসাহসী ইন্দ্রনাথের বুক এতটুকুও কাঁপলো না।

ইন্দ্রনাথ সিংহমূর্তির মুখগহ্বরে প্রবেশ করেই বিস্মিত হলো। একটা সিঁড়িমুখ তার পদতল স্পর্শ করলো। এবার ইন্দ্রনাথ আবছা অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলো।

সুন্দর পরিচ্ছন্ন সিঁড়ির ধাপগুলো।

নির্বিঘ্নে নামতে লাগলো ইন্দ্র।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে নিচে নামার পর একটা গুহার মধ্যে এসে দাঁড়ালো ইন্দ্রনাথ। গুহার দক্ষিণ পাশে এগিয়ে চলল সে। দেয়ালের পাশে পৌঁছতেই নজরে পড়লো চারকোণা একটা সাদা পাথর। ইন্দ্রনাথ বুঝতে পারলো এই সেই পাথর, যে পাথরখণ্ড সরিয়ে দেখতে পাবে একটি সিন্দুক....

এবার ইন্দ্রনাথ পাথরটা সরিয়ে ফেললো অনায়াসে। শক্তির দিক দিয়ে সে অসীম বলা যায়। ইন্দ্রনাথ পাথরখানা সরিয়ে ফেলতেই জ্যোতিষীর কথার সত্যতা অনুধাবন করলো। দেখলো একটা বিরাট আকার সিন্দুক রয়েছে কিন্তু আশ্চর্য তাতে কোনো তালা লাগানো নেই।

ইন্দ্রনাথ খুশি হলো, দ্রুতহস্তে সিন্দুকটার ডালা খুলে ফেললো। সিন্দুকটা খুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে একটা উজ্জ্বল বস্তু নজরে পড়লো।

এবার ইন্দ্রনাথ বুঝতে পারলো এই সেই মহামূল্যবান সম্পদ যা পাওয়ার আশায় জ্যোতিষী হন্যে হয়ে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, বন-জঙ্গল চাষে ফিরছে।

বস্তুটা তুলে নিলো হাতে ইন্দ্রনাথ।

চোখ দুটো জ্বলে উঠলো তার।

জীবনে সে এমন বস্তু দেখেনি।

ভাবলো ইন্দ্রনাথ, জ্যোতিষী তার দ্বারা এই অসাধ্য সাধন করিয়ে নেয়ার জন্য তাকে নিয়ে বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, চষে ফিরেছে, চষে ফিরেছে জম্বুর পর্বত। জ্যোতিষী ঠিকই গণনা করেছিলো, সাত রাজার ধন মাণিক দস্যুরাণী জম্বুর পর্বতের কোন গুহায় পূর্বে রাখলেও পরে তা সরিয়ে ফেলেছিলো এবং অজানা এক দ্বীপে যত্ন সহকারে রেখেছিলো। যাতে কেউ তার মহামূল্যবান বস্তুটা না যায়। এ সুড়ঙ্গপথ দস্যুরাণীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, হয়তো বা তার কোনো অনুচরও এ গুহার সন্ধান জানে না। আর জানে না বলেই রাণীজী নিশ্চিন্ত ছিলো, সিন্দুকে তালা লাগানো প্রয়োজন মনে করেনি। অবশ্য সিন্দুকে তালা লাগানো থাকলেও সেটা খুলে ফেলা ইন্দ্রনাথের মোটেই অসাধ্য ছিলো না। ইন্দ্রনাথ মূল্যবান পাথরটিসহ ফিরে এলো জ্যোতিষীর কাছে।

জ্যোতিষী জানতো ইন্দ্রনাথ পারবে বস্তুটি আনতে। তাই সে ইন্দ্রনাথকে বাহবা না দিয়ে পাথরটা ছোঁ মেরে কেড়ে নেবার মত করে হাতে তুলে নিলো, তারপর দ্রুত লুকিয়ে ফেললো বগলের নিচে।

খুশিতে জ্বলছে তার চোখ দুটো।

এবার ইন্দ্রনাথের হাত ধরে বললো–আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়, চলো আমাদের কাজ সমাধা হয়েছে....

ইন্দ্রনাথ ও জ্যোতিষী সুড়ঙ্গ পথে ছুটতে লাগলো।

কিছুদূর এগুতেই সুড়ঙ্গপথ বন্ধ হয়ে গেলো, সামনে একটা গোলাকার জলাশয়।

ইন্দ্রনাথ তাকালো জ্যোতিষীর দিকে।

জ্যোতিষী ইংগিত করলে সেই ক্ষুদ্র গভীর জলাশয়টির মধ্যে লাফিয়ে পড়ার জন্য।

ইন্দ্রনাথ জ্যোতিষীর ইংগিতমত গোলাকার জলাশয়টার মধ্যে লাফিয়ে পড়লো।

জ্যোতিষী নিজেও জলাশয়ে লাফিয়ে পড়ে ডুব মারলো। জলাশয়ে লাফিয়ে পড়ার সময় মহামূল্য পাথরটি সে চাদরের কোণায় ভালভাবে বেঁধে নিয়ে মাজায় জড়িয়ে নিলো।

ইন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিষী সেই সুড়ঙ্গপথে ডুব সাঁতার দিয়ে এগিয়ে চললো।

কিছুক্ষণের মধ্যে তারা এমন এক জায়গায় বেরিয়ে এলো যেখানে মাথার উপরে সূর্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ইন্দ্রনাথ মাথা তুলতেই পাশে জ্যোতিষীর উপরে নজর পড়লো। তীরে দাঁড়িয়ে জ্যোতিষী হাসছে।

ইন্দ্রনাথ হাত বাড়িয়ে দিতেই জ্যোতিষী পাশে একটা হ্যান্ডেলের মত বস্তু ঘোরাতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে পাথরচাপা পড়ে গেলো জলাশয়টির এপাশের সুড়ঙ্গমুখে।

গভীর জলাশয়ের মধ্যে বন্দী হলো ইন্দ্রনাথ।

দিশেহারা ইন্দ্রনাথ আবার ডুবসাঁতার দিয়ে পথ হাতড়ে চললো। ক্রমেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার।

তবু প্রাণপনে সাঁতার কাটছে সে।

কোনো কথা ভাববার মত অবস্থা তখন তার নয়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, এমন সময় মনে হলো একটা প্রবল স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ইন্দ্রনাথ ভুলে গেলো সবকিছু, সংজ্ঞা লুপ্ত হলো তার।

ওদিকে দস্যুরাণীর আদেশ পেয়ে তার বিশ্বস্ত অনুচর রহমত ও তার সঙ্গী বন্দীশালায় এসে বিস্ময়ে হতবাক হলো। দরজায় তালা বন্ধ অথচ বন্দী দুজন নেই। মাথায় বাজ পড়লো রহমত ও তার সঙ্গীর। তারা ফিরে গিয়ে কি জবাব দেবে রাণীজীর কাছে ছুটে এলো অন্যান্য অনুচরের কাছে। প্রহরীকে কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করতে লাগলো নানাভাবে কিন্তু আশ্চর্য, ওরা কিছুই বলতে পারলো না। বন্দীরা যেন হাওয়ায় উবে গেছে। কেউ তাদের সম্বন্ধে কিছু জানে না।

রহমত বা রাণীর কোনো অনুচর জানে না সেই মহামূল্যবান পাথরটি কোথায়। জম্বু পর্বতে না অজানা এই দ্বীপে। একমাত্র রাণীই জানে ঐ মহামূল্য সম্পদটি সে নিজে কোথায় রেখেছে। নিশ্চিন্ত আছে রাণী, কেউ কোনোদিন সেই বিস্ময়কর পথ আবিষ্কার করতে পারবে না বলেই তার বিশ্বাস।

রাণী তার দরবারকক্ষ ত্যাগ করেনি তখন। এমন সময় রহমত ও তার সঙ্গী ভীত কম্পিতভাবে এসে দাঁড়ালো। তাদের পেছনে এলো আরও কয়েকজন অনুচর, সবার মুখেই গম্ভীর এবং ভীত ভাব।

বলল দস্যুরাণী–তোমরা কি বলতে চাও? চুপ করে আছো কেন, বলো?

রহমত মাথা তুললো, কম্পিত কণ্ঠে বললো–রাণীজী বন্দী দুজন বন্দীশালায় নেই....

কি বললে?

রাণীজী, আমরা বন্দীশালার নিকটবর্তী হতেই দেখলাম বন্দীশালা শূন্য, তালা ঝুলছে।

প্রহরী–প্রহরী ছিলোনা?

ছিলো কিন্তু তারাও জানে না। বন্দীশালার দরজা বন্ধ অথচ ভিতরে বন্দীরা নেই।

চলো দেখবো কোথায় উবে গেলো তারা।

চলুন রাণীজী।

দস্যুরাণীর দুচোখে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। দ্রুত এগিয়ে চললো সে বন্দীশালার দিকে।

অনুচরগণ তার পেছনে পেছনে চললো।

*

সন্ন্যাসী বাবা তুমি, কিন্তু তোমার সঙ্গে ইন্দ্রকে দেখছি না যে? ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলো হুমায়রা।

সন্ন্যাসী জ্যোতিষীর কানে হুমায়রার কথা প্রবেশ করলো কিনা বোঝা গেলো না। সন্ন্যাসীর দুচোখে আনন্দদ্যুতি খেলে যাচ্ছে। ব্যস্ত গলায় বললো–আমাকে খেতে দে হুমায়রা। আমি বড় ক্ষুধার্ত, আজ তেরো দিন আমি অনাহারে আছি...

একি চেহারা হয়েছে তোমার? বললে হুমায়রা।

সে কথার কোনো জবাব দিলো না সন্ন্যাসী বাবাজী, সে হুমায়রাকে ঠেলে কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করলো।

হুমায়রা অবাক, কাপড়ের নিচে শালপাতায় জড়ানো কোনো একটা বস্তু লুকোবার চেষ্টা করছে সন্ন্যাসী বাবা।

কুটিরে প্রবেশ করে কুটিরের দরজা বন্ধ করে দেয় সন্ন্যাসী জ্যোতিষী।

হুমায়রা থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে আসে জ্যোতিষী সেই কুটিরের ভিতর হতে। হাতপায়ে ধুলো কাদা মাখানো, চোখে মুখে একটা উজ্জ্বল দীপ্ত ভাব। বেরিয়ে এসে হুমায়রাকে বললো জ্যোতিষী মা, হুমায়রা আমাকে খেতে দাও.... আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত,.... আমাকে খেতে দাও.... জানো মা, আমি এখন সাত রাজার চেয়েও অনেক বড়। আমার সিংহাসন চাই, রাজ প্রাসাদ চাই, সৈন্য–সামন্ত রাজ্য ঐশ্বর্য সব এখন দরকার হয়ে পড়েছে....

জ্যোতিষী বাবা, তুমি কি সব বলছো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি ইন্দ্রনাথকে নিয়ে গিয়েছিলে, সে কোথায় বাবা? তাকে তুমি কোথায় রেখে

এসেছো?

আর কোনো দিন আসবে না হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ আর কোনো দিন সে আসবে না...

সন্ন্যাসীর অদ্ভুত হাসি দেখে বিস্মিত হতবাক হয়ে গেছে হুমায়রা। লোকটা কি পাগল হয়ে গেলো। ইন্দ্রনাথকে কি তবে হত্যা করেছে।

কি ভাবছিস হুমায়রা? আমাকে খেতে দিবি না মা?

দেবো। তুমি হাতমুখ ধুয়ে এসো, আমি তোমার জন্য খাবার আনছি।

সন্ন্যাসী বলে উঠলো–তাই দে মা, তাই দে... আমি এখন সাত রাজার চেয়েও অনেক বড়। আনন্দে দিশেহারার মত বললো সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী হাতমুখ ধুয়ে এসে বসলো।

হুমায়রা একথালা ভাত ও তরকারি নিয়ে হাজির হলো, জ্যোতিষীর সামনে রেখে বললো বাবা খেয়ে নাও।

জ্যোতিষী গোগ্রাসে খেতে শুরু করলো।

হুমায়রা বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে দেখছে, এমন করে কোনো দিন সন্ন্যাসী বাবাকে সে খেতে দেখেনি। খাওয়া শেষ করে সন্ন্যাসী বাবা কুটিরের দাওয়ায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো।

হুমায়রা বললো–বাবা তুমি ঘরে গিয়ে বিছানায় ঘুমাও।

জ্যোতিষী হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে দুচোখ মুছে বললো–কদিন এমন করে মাটিতে শুতে পারিনি। মাটি স্পর্শ করার সুযোগ আসেনি আমার ভাগ্যে। দিন রাত বৈঠা চালিয়ে আমি সাগর পাড়ি দিয়েছি। আমাকে ঘুমাতে দে হুমায়রা, আমাকে ঘুমাতে দে...

অল্পক্ষণেই কুটিরের দাওয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে জ্যোতিষী।

হুমায়রা কুটিরে প্রবেশ করে, তার মনে নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে–জ্যোতিষী বাবা ইন্দ্রকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলো... এতদিন তারা কোথায় ছিলো–হঠাৎ জ্যোতিষী বাবা ফিরে এলো কিছু ইন্দ্রনাথ কোথায়? ইন্দ্রনাথকে হুমায়রা প্রাণ অপেক্ষা বেশি ভালবেসে ফেলেছে, তার প্রতিচ্ছবি তার হৃদয়পটে আঁকা হয়ে গেছে, সেই ইন্দ্রকে জ্যোতিষী বাবা কোথায় রেখে এলো। বলছে জ্যোতিষী বাবা, আর কোনো দিন সে ফিরে আসবে না.... কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ধক করে। উঠেচিলো হুমায়রার। সত্যি কি তাহলে ইন্দ্রনাথকে সন্ন্যাসী জ্যোতিষী হত্যা করেছে,... তারপর কি বা কোন্ বস্তু সে শালপাতা আর চাদরে জড়িয়ে কুটিরে নিয়ে গোপন করে রাখলো। বস্তুটা কি, যার জন্য জ্যোতিষী বাবা সাত রাজার চেয়েও নিজকে ধনবান বলে মনে করছে। হুমায়রা কুটিরে প্রবেশ করলো।

বিস্ময়ে চমকে উঠলো হুমায়রা, কুটিরের মেঝেতে বেশ কয়েক জায়গায় মাটি খুঁড়ে একাকার করা হয়েছে। একটি ছোট শাবল পড়ে আছে একপাশে।

ঠিক শাবলটার ধারে একটু গোলাকার আগলা মাটি।

হুমায়রা একটু দাঁড়িয়ে ভাবলো।

তারপর উঁকি দিয়ে দেখলো, দাওয়ায় নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে জ্যোতিষী বাবা।

এবার হুমায়রা শাবলটা নিয়ে কোণের মাটি সরিয়ে ফেললো, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে চমকে উঠলো, একটা উজ্জ্বল দীপ্ত বস্তু বেরিয়ে এলো মাটির তলা থেকে। হুমায়রা বস্তুটা তুলে নিয়ে ভালভাবে দেখতে লাগলো। ভাবতে লাগলো সে এটাই কি সেই সাতরাজার ধন মহামূল্যবান পাথর। এই পাথরের জন্য জ্যোতিষী হন্যে হয়ে ছুটে বেরিয়েছে তা জানে হুমায়রা। তবে কি এই পাথরের জন্য ইন্দ্রনাথকে হত্যা করেছে সন্ন্যাসী বাবা! হয়তো তাই হবে, নইলে ইন্দ্র এলো না কেন? ইন্দ্রনাথ আর কোনোদিন ফিরে আসবে না একথা সন্ন্যাসী বাবা বললো কেন?

হুমায়রা তন্ময় হয়ে দেখছে–অদ্ভুত এ বস্তু। কোনোদিন সে এমন বস্তু দেখেনি। পাথরটা থেকে একটা বিস্ময়কর আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসছে। সমস্ত কুটির আলোকিত হয়ে উঠেছে।

ভাবলো হুমায়রা এখন তার কি কর্তব্য।

সন্ন্যাসী বাবা ছাড়া এ দুনিয়ায় তার আপনজন কেউ নেই। এ অমূল্য সম্পদ তাকে সাবধানে রাখতে হবে। এবার হুমায়রা বস্তুটি পুনরায় সেই গর্তে রেখে মাটি চাপা দিলো।

কুটির থেকে বেরিয়ে এলো হুমায়রা।

একবার তাকালো সে জ্যোতিষী বাবার ঘুমন্ত মুখের দিকে। বড় ক্লান্ত লাগছে তাকে। মনে পড়লো ইন্দ্রনাথের কথা। তার মুখখানা মনে পড়তেই সে আনমনা হয়ে গেলো, সত্যি কি আর কোনোদিন ইন্দ্রনাথ ফিরে আসবে না। শুধু যে সে ইন্দ্রনাথের জন্য গভীর বেদনা অনুভব করছে তা নয়, আরও একজন ইন্দ্রের জন্য ভীষণ ব্যথিত সে অন্য কেউ নয়, ইন্দ্রের অশ্ব জাম্বু।

কেমন যেন মুষড়ে গেছে জাম্বু।

সব সময় ঝিমিয়ে থাকে, এমন কি ঘাস পর্যন্ত খায় না জাম্বু। মাঝে মাঝে ওর চোখ দিয়ে পানি পড়ে। পশু হলেও তার প্রাণ আছে, মন আছে।

হুমায়রা হাত বুলিয়ে দেয় ওর গলায় পিঠে।

জাম্বু বোঝে এখানে তার কেউ না থাকলেও ঐ একটি মেয়ে আছে যে তাকে ভালবাসে, আদর করে। তাই হুমায়রা এলে জাম্বু যেন অরেকটা সতেজ হয়ে ওঠে।

হুমায়রাও প্রায়ই অশ্ব জাম্বুর পাশে আসে এবং জাম্বুর শরীরে হাত বুলিয়ে ইন্দ্রনাথের স্পর্শ অনুভব করে।

জাম্বুর শরীরে যেন ইন্দ্রনাথের ছোঁয়া লেগে রয়েছে।

হুমায়রা তাই ভালবাসে ওকে।

এবার হুমায়রা কুটিরের উঠান থেকে বেরিয়ে আসে বাইরে। অদূরে জাম্বু দাঁড়িয়ে ছিলো আপন মনে।

হুমায়রা এসে দাঁড়ালো জাম্বুর পাশে।

ওর পাশে এসে গলায়–পিটে হাত বুলিয়ে দিলো হুমায়রা। জাম্বু মাথা নেড়ে আদর জানালো। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা যেন জাম্বুর সমস্ত মুখ জুড়ে ফুটে উঠেছে।

ওর চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে হুমায়রার চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

*

শহরময় সাড়া পড়ে গেছে রাষ্ট্রপ্রধান আসছেন দেশের দুর্গত এলাকাগুলো সম্বন্ধে দেশবাসিগণকে সজাগ এবং সচেতন করে তোলার জন্য। শহরের কেন্দ্রস্থলে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মনোরম মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। শহরের প্রধান প্রধান সড়কে তোরণ তৈরি হয়েছে। তোরণে তোরণে বিচিত্র কারুকার্য খচিত রাষ্ট্রীয় প্রতীক চিহ্ন।

মূল্যবান পতাকা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা রক্ষা করছে রাজপথর লাইট পোষ্টগুলোর অঙ্গ জুড়ে। রাষ্ট্রপ্রধানের আগমনে দেশবাসী ধন্য হবে, দেশের জনসাধারণ উপকৃত হবে। জনদরদী পরম দয়ালু বন্ধু রাষ্ট্রপতি আসবেন। তার দর্শন আশায় শত শত মানুষ উন্মুখ।

রাজপথ পরিস্কার রাখা হয়েছে।

পথে কোনো দীনহীন অসহায় ব্যক্তির প্রবেশ নিষেধ। এমন কি যেখানে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে তার আশেপাশে কোনো সাধারণ মানুষের যাওয়ার সুযোগ নেই। রাইফেলধারী প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। শুধুমাত্র দেশের সুধীসমাজ আমন্ত্রণপত্র পেয়েছেন, তাদেরই অধিকার আছে শুধু সেই সভায় প্রবেশের।

সুধীমহলে একটা আনন্দ হিল্লোল পড়ে গেছে।

রাষ্ট্র প্রধান আসবেন, দেশ ও দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ আসবেন তাঁর সঙ্গে। গগনস্পর্শী বক্তৃতায় জনগণকে বিমুগ্ধ করবেন। বিপুল জনতা পথের দুধারে ভীড় জমিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে এক নজর দেখবে তারা তাদের জনদরদী বন্ধুকে। শুধু তাই নয়, নেতৃস্থানীয় দরদী ভাইদের দর্শন আশায় উন্মুখ তারা।

মঞ্চের এরিয়ার মধ্যে প্রবেশের ক্ষমতা নেই সাধারণ কারও। তাই তারা দর থেকে একনজর চোখের দেখা দেখে অন্তরটাকে বিমোহিত করতে চায়।

জরদরদী নেতারা মঞ্চে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা বাক্যে দেশবাসিগণকে পরিতৃপ্ত করবেন।

করতালিতে মুখর হয়ে উঠবে আকাশ বাতাস।

রাষ্ট্রপতি ও তার পারিষদগণ দেশের দুর্গত এলাকা নিয়ে ভীষণ ভাবছেন। এমন কি তাদের চোখের নিদ্রা দূরীভূত হয়েছে। আহারে রুচি নেই। দুগ্ধ ধবল শয্যায় দেহ এলিয়ে ভাবেন তারা দেশের দুঃস্থ জনগণের কথা। মানুষগুলো কি করে বেঁচে থাকে, পেটে দানাপানি নেই, পরনে কাপড় নেই, পচা সঁতসেঁতে মেঝেতে ছেঁড়া মাদুর পেতে কি করে ঘুমায় ওরা। ঘরের চালা দিয়ে যখন বৃষ্টির পানি পড়তে তাকে তখন বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে কি করে ওরা? ওদের জন্য ভাবা যায়, প্রাণভরে দুঃখ করা যায় কিন্তু ওদের জন্য করবার কিছু নেই কারণ ওরা মানুষের অধম। ওদের জন্য করতে গেলে আরাম–আয়েশ বিসর্জন দিতে হয়, অনেক স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। তা কি সম্ভব, নরম তুলতুলে বিছানা ছাড়া যে নেতাদের ঘুম ধরে না, পথ চলতে গেলে পায়ে ধুলা লাগবে মানে জুতোয় কাদা লাগবে কাজেই গাড়ি ছাড়া চলা কঠিন। টেবিলে চাই সুস্বাদু খাদ্যসম্ভার, নাহলে কি খাওয়া যায়, দুধ কলা, ঘি, মাখন, ফলমুল এ সব যে স্বাস্থ্যের জন্য নিতান্ত দরকারী, এ সবের কোনোটাই বাদ দেয়া যায় না। দ্রব্যমূল্য বেড়েছে, এতে নেতাদের কি, তারা তো সরকারি বেতনভুক্ত কর্মকর্তা, হাজার হাজার টাকা তাদের হাতের ময়লা বলা যায়। সরকার তাঁদের আরাম আয়েশের জন্য সব রকম সুবিধা করে দিয়েছেন কারণ, তারা দেশের জনসাধারণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। দ্রব্যমূল বাড়লে তাদের কিছু যায় আসে না তবে চিন্তা ঐ কৃষক–শ্রমিক মজুর মুটেদের জন্য আর মধ্যবিত্ত যারা রয়েছেন।

নেতারা ভাবেন এদের কথা এবং সে কারণেই ভাব গদগদ কণ্ঠে বক্ততা দেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে, জোর গলায়। যে যত ভাল বলতে পারেন সরকার তাঁকে স্বীকৃতি দেন, পদোন্নতি করেন তাঁর। সত্যি এমন জনদরদী নেতা আর হয় না।

হায়রে জনগণ, তোমরা শুধু তোমাদের জনদরদী বন্ধুদের চেহারা দর্শন করে আর তাদের ভাবগম্ভীর গদ্গদ বক্তৃতা শ্রবণ করেই বেঁচে থাকো। মরে যাও তবু তোমরা টু–শব্দটি করো না, কারণ কথায় আছে মরলে হাতির পায়ের তলায় মরতে হয়.....।

নীরবে দাঁড়িয়ে ভাবছিলো এক শ্রমিক।

কান্দাই শহরের একটি রাজপথ।

লাইটপোষ্টের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো শ্রমিকটি। পরনে আধাময়লা জামা–কাপড়। মাথায় একটা তেলচিটে গামছা বাঁধা। হাতে পায়ে কালির ছাপ।

লোকটা কোনো কল–কারখানায় কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে। বড় ক্লান্ত তাই সে কোনো চায়ের দোকানে ঢুকেছিলো বিশ্রামের আশায়, হয়তো বা এক কাপ চও পান করছে তার সঙ্গে।

কখন যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে ওর খেয়াল ছিলো না। তাই বাড়ি ফিরছে সে। হঠাৎ নজরে পড়লো লাইটপোষ্টগুলোর দিকে। লাইটপোষ্টগুলোর গায়ে মূল্যবান কাপড়ে তৈরি জাতীয় পতাকা লটকানো হয়েছে। অদূরে বহু অর্থ ব্যয়ে তোরণ তৈরি করা হয়েছে, তোরণের কাজ এখনও চলছে।

পথ চলতে শুরু করলো শ্রমিকটি।

আংগুলের ফাঁকে অল্পমূল্য সিগারেট।

শরীরটা ঘামে ভিজা ছিলো, এখন ঘাম শুকিয়ে গেছে বাইরের বাতাসে।

ভালই লাগছে ওর পথ চলতে।

তোরণ তৈরি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অনেক খেটে খুটে রাতেই শেস করে ফেলবে ওরা, কারণ কাল সকালেই এই পথ দিয়ে যাবেন রাষ্ট্রপতি এবং তার পারিষদগণ।

অদূরে কান্দাই শহরের সবচেয়ে বড় মাঠ।

সেখানেই মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে।

শ্রমিকটি পথ চলছে আর ভাবছে সেই মঞ্চটির কথা। মঞ্চটি সে দেখেছে, ভারী সুন্দরভাবে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। মঞ্চের উপরে মখমলের আবরণ। রাজসিংহাসন সম আসন। মঞ্চের বহুদূর এলাকা ধরে থরে থরে সাজানো হয়েছে অতিথিদের আসন।

এ সব আসনে বসবেন কান্দাইয়ের স্বনামধন্য ব্যক্তিরা।

শ্রমিক এগিয়ে চলেছে।

পথের দুধারে ভোর হতে লোক জমে উঠবে। যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। এমন কি একটি লোকও চলতে পারবে না।

আজ সে তবু মন্তর গতিতে এগুচ্ছে, কাল এ পথে পা রাখার অধিকার তার থাকবে না, কারণ এ পথ জনদরদী বন্ধুদের।

কোনো দুঃস্থ অসহায় মানুষ জনদরদী বন্ধুদের চলার পথে অসুবিধা সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য ভোর থেকে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সত্যি বড় বোকা ওরা, ঐ দুঃস্থ অসহায় জনগণ। তার জানে না, তাদের মঙ্গলের জন্যই জননেতাগণ এত কষ্ট করে শহর পরিদর্শনে আসছেন এবং তাদের জন্য কিছু বক্তব্য রাখছেন। দেশে দুর্গত এলাকাগুলো মহান নেতাদের ভাবিয়ে তুলেছে। জনগণই তো দেশের শক্তি তাদের জন্য ভাবা একান্ত দরকার……

….হঠাৎ হেসে উঠলো শ্রমিকটা।

শূন্য পথে হাসি প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়লো।

চমকে উঠলো শ্রমিকটা। আশেপাশে কেউ নেই তো।

না, ভাগ্যিস কেউ নেই নইলে তাকে কৈফিয়ত দিতে হতো কেন সে এমন করে অহেতুক হাসলো। সত্যি কি সে অহেতুক হেসেছে।

তার নজর পড়লো ওপাশে জড়পিণ্ডের মত কে একটা লোক শুয়ে আছে। তবে কি লোকটা তার হাসির শব্দ শুনতে পেয়েছে।

না পায়নি, পৈলে নিশ্চয়ই সে ভালভাবে তাকিয়ে দেখতোবা।

শ্রমিক পাশ কেটে চললো। একবার সে ফিরে দেখলো লোকটা ঘুমাচ্ছে।

অদূরস্থ লাইটপোষ্টের আলো লোকটার শরীরে এসে পড়েছে। কাথা বা চট শরীরে জড়িয়ে শুয়ে আছে লোকটা। ভাবলো শ্রমিক, বেশ করে ঘুমিয়ে নাও বাবা, ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের ভারী বুটের গুঁতো খেয়ে জেগে উঠবে নেংটি কুকুরগুলোর মত।

সত্যি ওরা কুকুরের চেয়ে অধম।

নেই কোনো বাড়িঘর।

না আছে বিছানা, পথ ওদের শয্যা।

ক্ষুধার জ্বালায় ডাষ্টবীন হাতড়ানো ছাড়া উপায় নেই। দ্রব্যমূল্য যা বেড়েছে হাত পাতলেও কিছু পাওয়া যায় না। সবাই মাফ চায় মানে দিতে পারবো না। সুন্দর উক্তি বটে....আবার একটু হাসলো শ্রমিক।

পা যেন ওর চলতে চাইছে না।

বড় অবশ লাগছে দেহটা।

সারাটা দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর ছুটি। কান্দাই শহর এখনও নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েনি। যানবাহন চলাচল কমে এসেছে কিছুটা।

অনেকটা পথ হাঁটতে হবে শ্রমিকটাকে।

এবার সে পা চালিয়ে চলে।

তোরণ তৈরি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

একটি আর দুটি নয় তো।

অনেকগুলো তোরণ। নানা ধরনের প্রতীক চিহ্ন দ্বারা বিচিত্রময় করে তোলা হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় পতাকা, নানা বর্ণের আলোর ঝড় এসব তো রয়েছেই।

শ্রমিক চলেছে।

রাত বাড়ছে।

অনেক দূর তাকে যেতে হবে।

পথ ক্রমেই নির্জন হয়ে পড়ছে।

যানবাহন চলাচল ক্রমেই বন্ধ হয়ে আসছে।

শ্রমিক কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। এমন সময় রাস্তার পাশে কোনো এক বাংলো থেকে ভেসে আসে নারীকণ্ঠের করুণ আর্তনাদ.... বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও....

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো শ্রমিক, তারপর মুহূর্ত বিলম্ব না করে বাগানের প্রাচীর টপকে ভিতরে প্রবেশ করলো। কাঁচের শার্সীর আড়ালে দামী পর্দা দৃষ্টিকে রোধ করে রেখেছে। ওপাশ থেকে ভেসে আসছে ধস্তাধস্তির শব্দ।

শ্রমিক বিলম্ব না করে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় শার্সীর কাঁচ ভেঙে ফেলে। প্রবেশ করে সে ভিতরে। দেখতে পায় একটি লোক একটি নারীকে জাপটে ধরে ধস্তাধস্তি করছে।

নারীটি ক্ষুধার্ত ব্যাঘের থাবার নিচে মেষশাবক যেমন নিজেকে মুক্ত করে নেয়ার জন্য যুদ্ধ করছে।

কিন্তু নারীটি অসহায়, পুরুষটা কোনো এক অর্থশালী পৌঢ় বলিষ্ঠ ব্যক্তি।

শ্রমিক ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটার ওপর এবং তার ঘাড় ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলো সে। তারপর বসিয়ে দিলো ভীষণ এক ঘুষি। সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়ে দরদর তাজা লাল রক্ত বেরিয়ে এলো।

হাতের পিঠে নাকের রক্ত মুছে ফেলতে ফেলতে আশ্চর্য দৃষ্টি নিয়ে তাকালো লোকটা শ্রমিকটার দিকে। বললো–জানো কার কক্ষে প্রবেশ করেছো?

শ্রমিক মোটেই ঘাবড়ে যায়নি, সে স্বচ্ছ কণ্ঠে জবাব দিলো–জানি একজন দরদী নেতার বাংলোয় আমি প্রবেশ করেছি........ কিন্তু মেয়েটি কে, তাকে আমি চিনি না।

তুমি কে?

হাসলো শ্রমিক–আমি! আমি কে!

[পরবর্তী বই মায়ামৃগ]